চাঁলৈন

তন্‌চংগ্যা শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা



প্রকাশনায়
চাঁলৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

চালৈন

তন্‌চংগ্যা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা

সম্পাদক

হিরো তন্‌চংগ্যা

সহযোগী সম্পাদক

সাধন তন্‌চংগ্যা

প্রকাশনায়

চালৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

চাঙৈন

বিষু- ১৪২৩ বাংলা, ২০১৬ খ্রীস্টাব্দ
চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, (বিষু সংখ্যা)

সম্পাদক-

হিরো তন্‌চংগ্যা

সদস্য-সদস্যা

রাঙামাটি সরকারি কলেজের অধ্যয়নরত সকল তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র/ছাত্রী।

সহযোগীতায়-

মিলিন্দ তন্‌চংগ্যা (রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ)
তুফান তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ)
চন্দন জয় তঞ্চঙ্গ্যা (বান্দরবান সরকারি কলেজ)
নিক্সন তঞ্চঙ্গ্যা (রাজস্থলী)
রূপম তঞ্চঙ্গ্যা (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
অঞ্জলিকা তঞ্চঙ্গ্যা (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
উত্তম তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গুনীয়া ডিগ্রী কলেজ)
নিক্সন তঞ্চঙ্গ্যা (কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা)
দিবাকর তঞ্চঙ্গ্যা (সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম)
লক্ষী সাগর তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ)
কুশল তঞ্চঙ্গ্যা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যা (রাজস্থলী কলেজ)
জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যা (কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ)
অলনা তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি সরকারি মহিলা কলেজ)
অনুশা তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ)
সুদর্শন তঞ্চঙ্গ্যা (রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ)
সাধনা তঞ্চঙ্গ্যা (বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ)

প্রচ্ছদ-

সৌরভ তন্‌চংগ্যা, শিক্ষক, লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।

ডিজাইন ও মুদ্রণে ঃ সীবলী অফসেট প্রেস, কাকলী মার্কেট,
কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ফোন ঃ ০৩৫১-৬১৮৮২

শুভেচ্ছা মূল্য - ১২০/-
ছাত্র-ছাত্রী- ৬০/-

সম্পাদকীয়

শুরুতে জানাই সকলকে বিষু বা বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিষু মানে বিদায়, বিষু মানে বরণ। বিষু মানে বিগত বছরের শত দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে নতুন বছরের অনাবিল সুখ শান্তির প্রত্যাশা। এদেশে প্রায় অর্ধশত ভাষাভাষী লোকের বসবাস। তার মধ্যে ১১টিরও অধিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তিন পার্বত্য জেলায় বসবাস করছে। এই ১১ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাঁরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে নানা রঙ-বেরঙ্গের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিষু (বাংলা নববর্ষ) উদ্‌যাপন করে আসছে। তাই বিষু হয়ে ওঠে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর বাঁধ ভাঙ্গা অফুরন্ত আনন্দের উৎসব। বিষু হয়ে ওঠে আমাদের মাঝে সম্প্রীতির সুবাতাস। যেখানে আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুর মেলায় আমাদের অতীত ও বর্তমান বন্ধনের ঝংকার।

সংকলনটি প্রকাশে যারা আমাদেরকে আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ও সু-পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সংকলনটিকে সাহায্য-সহযোগিতা হাত বাড়িয়েছেন, তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা এ প্রকাশনাটিকে মূল্যবান লেখা দিয়ে প্রকাশের পূর্ণতা করেছেন। আর দুঃখ প্রকাশ করছি যাদের লেখা ইচ্ছা থাকার সত্ত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে ছাপাতে পারিনি। প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে শুভানুধ্যায়ী, পাঠকমহলের নিকট ক্ষমা ও সুপরামর্শ কামনা করছি।

পরিশেষে, ১৪২৩ বাংলা নববর্ষ (বিষু) সবার সুখ, শান্তি, অনাবিল আনন্দ বয়ে আনুক এই প্রত্যাশা রইল।

হিরো তনচংগ্যা
সম্পাদক
চালৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙামাটি সরকারি কলেজ।

সূচিপত্র

ত্রিদেশে তঞ্চঙ্গ্যাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা

আর্যজ্যোতি ভিক্ষু

সূচনা

ত্রিদেশ অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের একটি জনগোষ্ঠীর নাম তঞ্চঙ্গ্যা। দেশ তিনটিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। মায়ানমারে তাদের পরিচয় দৈংনাক, বাংলাদেশ ও ভারতে তঞ্চঙ্গ্যা। তবে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারিভাবে এখনো তঞ্চঙ্গ্যা পরিচয়ে স্বীকৃতি না পাওয়ায় তারা অফিস-আদালতে চাকমা উপাধি লিখে থাকেন।

তঞ্চঙ্গ্যাগণ প্রায় ভুলেই গেছে যে ভারত ও মায়ানমারেও তাদের জনবসতি রয়েছে। আশির দশকে তারা জানতে পারে যে, ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমারে তাদের লোক বসতি রয়েছে। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে তিন দেশের তঞ্চঙ্গ্যাগণ এখন জানতে পারছেন কে কোথায় ও কি অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। তবে দেশ তিনটিতে আলাদাভাবে তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর উপর আদমশুমারী না হওয়ায় কোন দেশে তঞ্চঙ্গ্যা জনসংখ্যা কত তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এ প্রবন্ধে দেশ তিনটির কোন রাজ্যে/প্রদেশে, জেলাতে বা অঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদের অবস্থান রয়েছে তা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এই প্রবন্ধে তঞ্চঙ্গ্যাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা করার আগে তারা কোথা থেকে মায়ানমার, বাংলাদেশ ও ভারতে পৌঁছেছিল সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

তঞ্চঙ্গ্যাগণ নিজেদেরকে শাক্যবংশজাত বলে দাবি করেন। মায়ানমারের ইতিহাস মতে, তারা শাক্যবংশ উদ্ভূত। সেই সময়ে আরাকান রাজা তাদের নতুন পরিচয় দেন দৈংনাক নামে। পরবর্তীতে তারা তৈন্‌গাঙ্যা থেকে তঞ্চঙ্গ্যা/তনচংগ্যা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হি পিঙের মতে (He Ping, page-540), "সাক হলো একটি পুরাতন তিব্বতি-বর্মী দল যারা হলুদ নদীর (হোয়াং-হো) উজান দিক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে চলে পাড়ি জমান মায়ানমারের উদ্দেশ্যে।" মায়ানমারের ইতিহাস মতে, ৮৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে শাক্যবংশের রাজা অভিরাজা স-বংশে কপিলাবস্তু ত্যাগ করে মায়ানমারের উত্তরপ্রান্তে তাগং নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

তারা নূন্যতম দুই থেকে তিন শত বছর পর্যন্ত তাগং প্রদেশে বসবাস করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সেখান থেকে মিচ্ছাগিরি নামে ইরাবতি নদীর তীরে বসবাস করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। দান্যাওয়াতি আয়েদবুং নামক বর্মীয় ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, চৌদ্দ শতাব্দীতে আরাকান রাজা (মগ রাজা) শাক্য রাজার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার কুমন্ত্রণায় একজন সুন্দরী কন্যা উপকার দিয়েছিলেন। খবরটা জেনে শাক্যরাজা আনন্দিত হয়ে সুরাপান এবং রমণীর সাথে সম্ভোগে রত হন। সেই সুযোগে মগ সেনাপতি শাক্যরাজ্য আক্রমণ করে শাক্যরাজাকে পরাজিত করেন এবং তাঁকে স-গোত্রে আরাকান রাজ্যে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন (১৩৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ, ৬৯৫ মগাব্দ)। তখন শাক্যবংশীয় সৈন্যগণ কালো রঙের ঢাল দিয়ে যুদ্ধ করতেন। সেই জন্য মগ রাজা তাদেরকে জরিমানা করেছিলেন। কালো রঙের ঢালকে আরাকানি ভাষায় দাইন-আনেক বলা হয়। তখন থেকে শাক্যবংশরা দাইন-নাক (দৈংনাক) নামে আরাকানিদের দ্বারা আখ্যায়িত হতেন।

উপরন্তু, উল্লেখিত বর্মী ইতিহাস গ্রন্থ (পৃ-১৪) অনুসারে, শাক্য রাজার তিন পুত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তারা শাক্যরাজ্য হতে আরাকান রাজ্যের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পালিয়ে যান। জ্যেষ্ঠপুত্র সা-ক্যে নামক স্থানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যমপুত্র সা-প্রেই শহরে বসতি স্থাপন করেন। কণিষ্ঠপুত্র সাগাইন রাজার অধীনে বাস করায় রাজা তাম্মিন নামক এক শহর তাকে উপহার প্রদান করেন।

শ্রী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা'র তঞ্চঙ্গ্যা জাতি (পৃ-৯) অনুসারে, "আরাকানিরা খুবই অত্যাচার করত। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে তারা সা-প্রেই পরিত্যাগ করেন। অতপর গভীর জঙ্গল পার হয়ে তারা জামাল উদ্দিন খাঁর রাজত্বকালে চট্টগ্রামে পৌঁছেন। তিনি ১২ খানি গ্রামে বারোজন তঞ্চঙ্গ্যা তালুক/আমু (গ্রামের প্রধান) নিয়োগ করেছিলেন। সেই বারোটি আমু/তালুক থেকে তঞ্চঙ্গ্যাদের বারোটি গছা সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন- ১। কারবা গছা, ২। ধন্যা গছা, ৩। মংলা গছা, ৪। মেলং গছা, ৫। হাং গছা, ৬। অঙ্য গছা, ৭। লাপস্যা গছা, ৮। তামুলুক গছা, ৯। রাঙ্গি গছা, ১০। আঙু গছা, ১১। তাস্‌সি গছা ও ১২। মুঅ গছা।

পরলোকগত শ্রী বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা'র তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি (পৃ-১১) মতে, "প্রথম শাক্য দলের সাথে আরও একদল শাক্য পশ্চাদগমন করেছিলেন লামা, মহকুমা ও অন্য জায়গায়। দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলকে খুঁজে না পেয়ে আরাকানে রয়ে গিয়েছিল।"

চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর আমলে দৈংনাকের একজন ফা-প্রু নামে ৪০০০ জনকে সঙ্গে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করেন। তারা রাজাকে এক জোড়া হাতি ও অলঙ্কার উপঢৌকন দিয়ে সেখানে বসবাসের অনুমতি পেয়েছিলেন। এছাড়াও দৈংনাকগণ সবাই মিলে চাঁদা তুলে পর্তুগিজ-নির্মিত লালবাড়িটি (বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের ডিসি বাংলো)

ক্রয় করে চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা ধরমবক্স খাঁ তাদেরকে শাক্য বা চাকমা হিসেবে স্বীকার না করে তৈন্‌গাঙ্যা নামে সরকারি দলিলভুক্ত করেছিলেন। কারণ, তারা তৈন্‌গাঙ থেকে এসে ছিলেন। দেবনাথের মতে, "তঞ্চঙ্গ্যারা তৈন-খ্যং বা তৈন্‌ছড়ি (মাতামুহুরী নদীর একটি উপনদী) অঞ্চলে তাদের প্রথম বসতি গড়ে তোলার সাথে সম্পর্ক ছিল" (পৃ-৫৫)। দেবনাথ এও মত দেন যে, "তারা মাতামুহুরী উপত্যকা (পার্বত্য চট্টগ্রাম) এর উপরের অংশে বসতি স্থাপনের জন্য আরাকান থেকে এসেছিল (দেবনাথ, পৃ-৫১)। শ্রী বীরকুমার উল্লেখ করেন, দৈংনাকরা চাকমা হিসেবে গণ্য না হলেও রাজা নিজ প্রজারূপে তাদের পালন করে ছিলেন। তারা নিশ্চয় তৈন্‌গাঙে অনেক বছর জীবন যাপন করে ছিলেন।

রাইংখ্যং উপত্যকায় তঞ্চঙ্গ্যাদের বসবাস আনুমানিক এক থেকে দুইশত বছর ধরে। বাবু রতিকান্ত তাঁর তঞ্চঙ্গ্যা জাতি গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৪) উল্লেখ করেন, তঞ্চঙ্গ্যাগণ সর্বপ্রথম অভিযান করেছিলেন ধরমবক্স খাঁর আমলে (১৮১২-৩০ খৃস্টাব্দ) শ্রীধন আমুর নেতৃত্বে, ৩০০ পরিবার নিয়ে। তারা সোনা, রূপা ও নানান ধরণের অলঙ্কার উপহার দিয়ে সাক সার্কেলে বাস করার অনুমতি পেয়েছিলেন। তারা নিশ্চয় রাইংখ্যং উপত্যকায় বসবাস করেছিলেন। কারণ, রাইংখ্যং উপত্যকায় খুব প্রাচীন তঞ্চঙ্গ্যা জনপদ। সেই সময়ে রাইংখ্যং অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ও উর্বর। হাঁড়ি-ভরা মাছ আর গোলাভরা ধান ছিল প্রতিটি পরিবারে। তবে প্রতিনিয়ত লুটপাট, ডাকাতি ও বহিঃশত্রুর নিপীড়নে নিরাপত্তাহীন ছিল জনজীবন।

প্রায় শত বছর পর রাইংখ্যং অঞ্চল থেকে ঠেগা-নদী হয়ে কিছু তঞ্চঙ্গ্যা ভারতের মিজোরাম প্রদেশে, কিছু ত্রিপুরা রাজ্যে পৌছেছিল। ধারণা করা হয়, সেটি ছিল চাকমা রাজনীতিবিদ বাবু স্নেহ কুমার দেওয়ান (১৯৪০ খৃষ্টাব্দ) বিপ্লব চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা কালীন। তবে আরও কিছু সময় পরে ১৯৬০ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণোত্তর কতিপয় তঞ্চঙ্গ্যা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কিছু তঞ্চঙ্গ্যা রাইংখ্যং অঞ্চল ত্যাগ করে বান্দরবানের মহকুমা, রোয়াংছড়ি, বালাঘাটা, রেইছা প্রভৃতি স্থানে বসতি গেড়েছিল। এই হল বর্তমান তঞ্চঙ্গ্যাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তঞ্চঙ্গ্যা/দৈংনাকগণ কপিলাবস্তু ছেড়ে মায়ানমারের আরাকান, পরিশেষে বাংলাদেশ এবং পুনরায় ভারতে পৌছেছিল। অতপর ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার এই ত্রিদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নির্মিত হলো তাদের স্থায়ী বসতি। সকল দেশেই তারা পরিণত হলো বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে এক ক্ষুদ্র জনজাতি হিসেবে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জনসংখ্যা

এখন পর্যন্ত তঞ্চঙ্গ্যাদের উপর যত জরিপ হয়েছে, তার সবই বাংলাদেশে। তাই বাংলাদেশে তঞ্চঙ্গ্যাদের সংখ্যা কত- তার একটি আনুমানিক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু ভারত ও মায়ানমারে অবস্থানকারী তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা সম্পর্কে জানা যায় না।

ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইনের মতে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৮০০ জন। তবে চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর আমলে দৈংনাকদের একজন ফা-প্রু নামে ৪০০০ জন তঞ্চঙ্গ্যা নিয়ে মায়ানমার হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন। মনে হয়, ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইনের গণনার পর তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে পৌঁছেছিল। Evaluation of Integrated Community Development Programme এর তথ্য মোতাবেক ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা ১৯,২১১ জন। বাংলাদেশের আদমশুমারী অনুযায়ী- ২০০১ সালে তঞ্চঙ্গ্যা ছিলেন ৩১,১৬৪ জন। অপর এক হিসাবে বলা হয়, তঞ্চঙ্গ্যাদের মোট জনসংখ্যা ৫১,৭৭৩ জন (সূত্র ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০১২ইং)।

বাংলাদেশে অবস্থিত তঞ্চঙ্গ্যা জনপদগুলোর নাম তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলা ঃ দীঘলছড়ি, ঝগড়াবিল, রাঙ্গাপানি, বৈল্যা, সোনারাম কার্বারী আদাম, ডলুছড়ি, কলাবুন্যা, আমছড়ি মঙ্গন, রইন্যাছড়ি, অগৈয়াছড়ি ও বল্টুগাছ মঙ্গন।

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলা ঃ ছোট পাগলী, দেবতাছড়ি, মহাজন পাড়া, খিলাকিচিং, আদ্ধান্যা মঙ্গন, কুরুতলী মঙ্গন, আমলকি ছড়া, কুকিমারা, হাতিমারা, ত্রিপুরাছড়ি, সাপছড়ি, সাপছড়ি মঙ্গন, আগুনিয়াছড়া, কাঠাল তলী, ঢেঁকিকাটা ছড়া, গর্জনীয়া পাড়া, বড় পাগলী, বটতলী, বাইনালা, ওয়াগ্গা যৌথ খামার, দলুন্যা, ওয়াগ্গা হেডম্যান পাড়া, রামপাহাড়, নুনছড়ি মঙ্গন, রেশম বাগান, বারঘোনিয়া, শিলছড়ি, বেঙছড়ি, দুরছড়ি, হরিণছড়া, আড়াছড়ি, ভাঙ্গামুরা, চাইলতা পাড়া, জগনাছড়ি, কারিগর পাড়া, ভালুক্যা, তিনছড়ি, লামাছড়া ও মিরিছড়া। কাউখালী উপজেলা ঃ বগাপাড়া, ঘাগড়া, ছড়া পাগলী, সাক্রাছড়ি, দেবাংখিলি ও মগাছড়ি।

রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলা ঃ ঘিলাছড়ি, নাড়াছড়ি, ডাক্তার পাড়া, হেডম্যান পাড়া, ঝাম্দি মঙ্গন, কোরবান ছড়ি, কাঁকড়াছড়ি, চিংক্ষ্যং (বাকী গ্রামগুলোর নাম পাওয়া যায়নি)।

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা ঃ কুতুবদিয়া, তিন কুনিয়া, শাক্রাছড়ি, ধুপশিল, ফারুয়া, ওরাইছড়ি, তক্তানালা, সুক্কছড়ি, গোয়াইনছড়ি, এগুজ্যাছড়ি, তাংকো থাং, দীঘলছড়ি,

সুদূর জুরাইছড়ির দুমদুম্যা, নতুন বাজার প্রভৃতি গ্রামে দীর্ঘকাল ধরে তঞ্চঙ্গ্যা বাস করে আসছেন। তবে জুরাইছড়িতে অবস্থিত তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামগুলোর নাম পাওয়া যায়নি।

বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা ঃ বালাঘাটা, রেইছা, তুম্রু পাড়া, খৈয়াপাড়া, যৌথখামার, দাঁতভাঙ্গা, রাবার বানা, মিঞ্জিরি, সিনিয়র পাড়া, সুয়ালক, তঙ্কাবতী, রোয়াংছড়ি এবং বটতলী নামক গ্রামে তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা প্রায় ১৫,০০০ জন। অপরদিকে বান্দরবান জেলার নাক্ষ্যংছড়ি, আলীকদম, রোয়াংছড়ি প্রভৃতি উপজেলায় বসবাসকারী তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামগুলোর নাম সংগ্রহ করা এখনো সম্ভব হয়নি।

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলাধীন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামগুলো হচ্ছে- শিলখালী, হরিখোলা, লাম্বাঘোনা, আমতলী, পুতিবনিয়া, কাটাখালী ও নাটলিখোলা এবং উখিয়া উপজেলায় মনখালি, মতেরবনিয়া, শিলছড়ি, মোছারখোলা ও তেলখোলা অঞ্চলে প্রায় ৭,০০০ তঞ্চঙ্গ্যার বসবাস রয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলাধীন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামগুলো হচ্ছে- রইস্যাবিলি, ধর্মকুয়া, চৌচালা বিল, বেতছড়ি, বাইনালা ও তিনছড়ি। বাংলাদেশের আদমশুমারী যদিও বলে যে, তঞ্চঙ্গ্যাদের সংখ্যা অর্ধলক্ষাধিক। আসলে বাংলাদেশে তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রকৃত জনসংখ্যা তার চেয়েও কিছু বেশি।

ভারতের মিজোরাম প্রদেশে Lawngtlai, Chakma Autonomous District Council I Lai Autonomous District Council মিলে তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা প্রায় ৮,০০০ জন। চাকমা জেলায় তঞ্চঙ্গ্যাদের গ্রামগুলো হচ্ছে- ১. বন্দুকভাঙা, ২. বর কলক বা শিলছড়া, ৩. ওল্ড ছিপ্পুই, ৪. নিউ ছিপ্পুই, ৫. দাম্পেই, ৬. বিল্লছড়া, ৭. চিগন গুইছড়ি, ৮. গেরাছড়ি, ৯. চেরা আদাম, ১০. ফুলছড়া, ১১. লংপুইঘাট, ১২. বাসিথ্লাং, ১৩. বড়থলি, ১৪. কবাখালি, ১৫. লাম্বাছড়া, ১৬. মিনাবাপ ছড়া, ১৭. কুকুর দুলেয়া, ১৮. সমনি ছড়া, ১৯. বেতবন্যা, ২০. দুরছড়া ও ২১. বড় গুইছড়ি।

লাই জেলায় তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামসমুহ নিম্নরূপ ঃ ১. সাইখথ্লির, ২. দুম্‌জাউ, ৩. সেকুলকাই, ৪. এম কঁপুই, ৫. সাইবহ্, ৬. চিকুরলুই, ৭. বাঙ্গাল্যা আদাম, ৮. ভাসেইকাই, ৯. ঙালিম লুই।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের দড়িাণ দিকের জেলা গমতি ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় তঞ্চঙ্গ্যাগণ বসবাস করেন। উত্তর ত্রিপুরা ও ধালাই জেলায়ও তঞ্চঙ্গ্যা বসতি রয়েছে। তবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় তারা চাকমা পরিচয় ব্যবহার করে থাকেন। সেখানকার তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামগুলো হচ্ছে থুইকারম, পূর্ব মানু, ডুল্যাছড়া (বড়আদাম), দেবিপুর, খাকাই, ছগড়িয়া, খসকছড়া, আদিপুর, গাবুর ছড়া, রতনপুর প্রভৃতি। সেখানে তঞ্চঙ্গ্যাদের আনুমানিক জনসংখ্যা ৮,০০০ জন।

মায়ানমারে তঞ্চঙ্গ্যাগণ দৈংনাক নামে পরিচিত। সেখানে ইয়াংগুন বিভাগ, ছিন প্রদেশ ও রাখাইন স্টেটের অধীন মংডু, বুসিদং, ক্যাক্-থ, মং-থ, ম্রক-উ, রিসিদং, মিম্ব্যা, পালা ওয়া প্রভৃতি এলাকায় প্রায় ৮০খানা গ্রামে তঞ্চঙ্গ্যা বসতি রয়েছে। সেখানে তঞ্চঙ্গ্যা মোট জনসংখ্যা ৮০,০০০ বলে অনুমান করা হয়।

এখানে মায়ানমারে অবস্থিত তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামগুলোর নাম অঞ্চলভেদে তুলে ধরার চেষ্টা করছি-

১। বুসিডং অঞ্চল ঃ ১. তাইমাই চুঅং, ২. চং-চ রোয়া, ৩. লং চুং, ৪. প্রিঁ চুং, ৫.নাখাইন ডং, ৬. হ্অং চুং, ৭. মিংক্যঙং স্বী, ৮. বওঁ, ৯. ইয়াং বং, ১০. রোয়া চিয়া, ১১. পায়েং গু মা, ১২. আহুং চুং (২), ১৩. ডু ধাইঁ, ১৪. পোক্কাইজ, ১৫. চাকমা উগাইঁ, ১৬. পিরাক প্যে, ১৭. সাং চুং, ১৮. সা ইন প্রা, ১৯. মেয়াইন জারি, ২০. বাহু প্রাং, ২১. পোক ক্যে ওয়া, ২২. উ প্রো, ২৩. রেঃ কেওয়া, ২৪. মং নে রোয়া, ২৫. লং লু কং, ২৬. রোয়া হউং, ২৭. ঙা ম্রাং বঅ, ২৮. কালাবি মরং, ২৯. কথি হা, ৩০. রোয়া সেইক, ৩১. বাবুং, ৩২. বা ধ ঘা, ৩৩. নেয়ুং চুং, ৩৪. সাবাইক ডং, ৩৫. বুথিডং টাউনশিপ, ৩৬. তং ম রোয়া, ৩৭. আতং প্রা, ৩৮. কাং চুং, ৩৯. তিঁ তং প্রাং, ৪০. কোয়াইঁ চুং।

২। মাম পিয়া অঞ্চল ঃ ৪১. ইয়াং বম ওয়াইং, ৪২. উ পিং ডং, ৪৩. সোয়েয়া ডং, ৪৪. পেয়াইঁ ম্রং, ৪৫. লাক পা-ইন গং, ৪৬. জি গং, ৪৭. মিজি পাং সু।

৩। ক্যক্-থ অঞ্চল ঃ ৪৮. লি সাইন ডং, ৪৯. ক্যক ত টাউনশিপ, ৫০. রোয়া মা প্রাং, ৫১. ডুখাই চুং, ৫২. সা-পেই গং, ৫৩. পুং ডাইন, ৫৪. ক্যক ডাইন, ৫৫.পেয়াইং ম্রং, ৫৬. আলি জয়াইঁ।

৪। মং-থ অঞ্চল ঃ ৫৭.মিচিক, ৫৮. সং ভালা, ৫৯. তং মুরু, ৬০. রে চুং প্রাং, ৬১. থা মা-ইন থা, ৬২. সুই হা আয়্যে, ৬৩. রাঙা জি জি, ৬৪. ওই হা ডং, ৬৫. মাঙ্গালা নুআইন, ৬৬.অং থা ব্রে, ৬৭. সালেই ডং, ৬৮. রা নং ঙাসা।

৫। ম্রক-উ অঞ্চল ঃ ৬৯. নাইং জ, ৭০. রঅ পুং গং, ৭১. মিজলি গং, ৭২. অং রে।

৬। পুন্যা ক্যউইন অঞ্চল ঃ স্রাং ড।

৭। পালা ওয়া ঃ ৭৪. থাথি গং, ৭৫. থাঘা চুং, ৭৬. রে আয়্যে চুং। এছাড়া আরও কয়েকটি গ্রাম বাদ গিয়ে থাকতে পারে।

সুতরাং তিনটি দেশে (বাংলাদেশে ৮০,০০০, ভারতে ১৭,০০০ ও মায়ানমারে ৮০,০০০) তঞ্চঙ্গ্যাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১,৭৭,০০০ জন।

উপসংহার ঃ তঞ্চঙ্গ্যাদের ইতিহাস বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য না পেলেও মায়ানমারের ঐতিহাসিক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত্ত তথ্যগুলোকে সঠিক বলে ধারণা করা হয়। কারণ, মায়ানমারে এখনো প্রায় ৮০,০০০ তঞ্চঙ্গ্যা রয়ে যাওয়ায় (যাদের দৈংনাক পরিচয়ে

সেখানকার সবাই চিনে) মায়ানমারের ইতিহাস গ্রন্থে তারা ঠাঁই পেতে সক্ষম হন। এবং তাদের সাথে বাংলাদেশ ও ভারতে অবস্থানকারী তঞ্চঙ্গ্যাদেরও কৃষ্টি ও পোশাকে এখনো সাদৃশ্য রয়েছে। আমার এ লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল তঞ্চঙ্গ্যাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া। তবে নির্ভুল তথ্য দেয়া সম্ভব হয়নি যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে। ভবিষ্যতে তঞ্চঙ্গ্যাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা বিষয়ে আরও গভীর অনুসন্ধানের অবকাশ রাখে।

সূত্র ঃ

Debnath, R. (2011, March-April). Ethnicity of Chakma and Tanchangya. Journal of Applied Science & Social Science, Vol. II (No. 1), %1-55

Ping, H. (2006). Rise and fall of Kantu: A historical study of an ancient Tibeto-Burmese Speaking group. Frontiers of History in China, Vol.1 (Issue 4), 535-543.

বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি (১৯৯৫), বান্দরবান ঃ তঞ্চঙ্গ্যা মহাসম্মেলন।

রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা জাতি (২০০০), রাঙ্গামাটি।

ওতাইছিং তঞ্চঙ্গ্যা, টেকনাফ, কক্সবাজার। জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা, বিলাইছড়ি, রাংগামাটি।

দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা, এডভোকেট, জেলা দায়রা ও জর্জ কোর্ট, রাঙ্গামাটি।

তঞ্চঙ্গ্যা, দি. পি. জি. কৃষণ, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান। বিনদ তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা রাজ্য, ভারত।

ননী তঞ্চঙ্গ্যা, মিজোরাম, ভারত। চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা, পাত্তুরু তুরু (২০১৪), প্রথম তঞ্চঙ্গ্যা কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থকার, রাঙ্গামাটি।

লেখক পরিচিতি ঃ পেরাডানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীলঙ্কা।

তালিক শাস্ত্র ও চাকমা বর্ণমালা

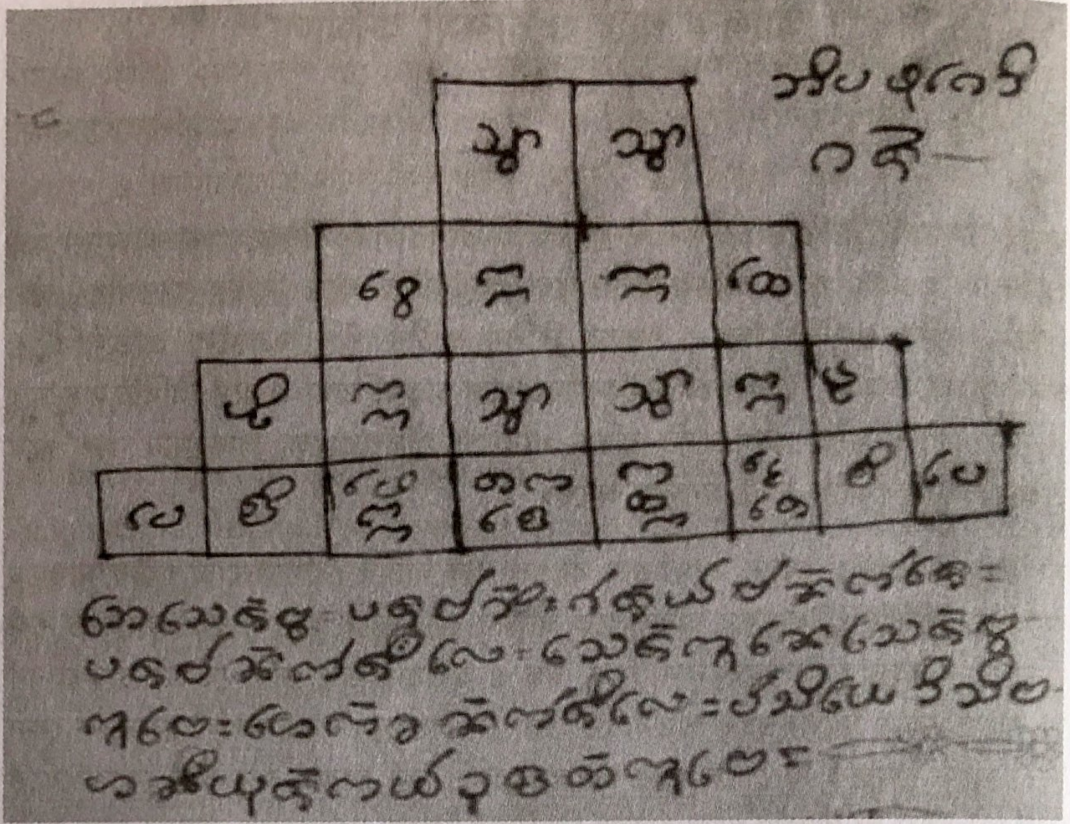
- মৃত্তিকা চাকমা

বাংলা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পান্ডুলিপিগুলো বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে লিপিকরদের দ্বারা অনুলিখিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় পঠন পাঠনের জন্য প্রচলিত ছিল। এভাবে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি পত্রগুলো প্রতিলিপি ও অনুলিখন হয়ে আছে। ঠিক তেমনি বৈদ্যদের দ্বারা চাকমা ভাষা ও বর্ণে লিখিত তন্ত্র মন্ত্র ও কবি (গীতি কবি) লেখকদের রচিত পুরোনো পুঁথিপত্রগুলো আবহমান কাল ধরে চাকমা সমাজের মধ্যে বিপ্তি অবস্থায় আছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন সংখ্যাগুরু ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের দাপটের মাধ্যমে কালানুক্রমে নিজ মৌলসত্তার অবলুপ্তিকে স্বীকার করে নিয়ে আপন ভাষা, সংস্কৃতি শব্দ ও বর্ণের ব্যবহার্যতা সম্পর্কে নানা দ্বিধা, দ্বন্ধ ও অনীহার জন্ম দেয়, তেমনি চাকমা বর্ণ বা অক্ষরগুলোও বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে চিন্তা সে নিজগুনে যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন নিত্য নতুন খোরাক না পেলে তার ক্ষয় অনিবার্য। যার কারণে ক্ষয় হয়ে যেতে যেতে বর্তমানে বৈদ্য বা অঝারা ছাড়া আমরা নিজেরাই নিজের বর্ণমালাকে অচেনা ভিন দেশী বর্ণমালার মত মনে করতে দ্বিধা করছিনা।

অথচ চাকমা বর্ণমালায় লিখিত প্রাচীন পুঁথিপত্র, বৈদ্যদের তন্ত্র মন্ত্র ও তালিক শাস্ত্রের দ্বারা বিভিন্ন জটিল রোগ ব্যাধির চিকিৎসা এবং পারিবারিক সামাজিক রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা ও লৌকিক আচার ক্রিয়া কর্মগুলো সমাধা করে আসছে; হয়তো ভবিষ্যতেও করবে।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না বলে পারছি না। সেটা হচ্ছে ১৯৭০ সালে বাবা যখন আমাকে স্থানীয় একটি বৌদ্ধ বিহারে (লোগাং বরপেরা বৌদ্ধ বিহার) এক সপ্তাহের জন্য শ্রমণ করে দেন। এই এক সপ্তাহের মধ্যে লক্ষ্য করলাম বিহার অধ্যক্ষের বাংলা বর্ণের ধর্মীয় কোন বই পুস্তক নেই। তাহলে তিনি কিভাবে এত গুলো সুত্র মুখস্ত করে দায়ক-দায়িকাদেরকে সুত্র পাঠ করতেন ? জেনে নিয়ে দেখি তিনি বাংলা জানা অন্য কারও কাছ থেকে চাকমা বর্ণে শ্রুতি লিখন করতেন আর যাদের চাকমা ও বাংলা অক্ষর জ্ঞান আছে তাদের মাধ্যমেও অনুলিখন করে নিতেন। পরবর্তীতে গ্রাম অঞ্চলে লক্ষ্য করলাম চাকমা বর্ণমালার সাহায্যে ধর্মীয় গাঁথা ও সুত্রগুলো ঠিক অনুরূপভাবে অনুলিখন করে বাংলা অক্ষর জ্ঞানহীন চাকমা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়া কর্ম গুলো সম্পাদন করতেন। বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করলে হয়তো এরকম দু'একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ এখনো পাওয়া যেতে পারে।

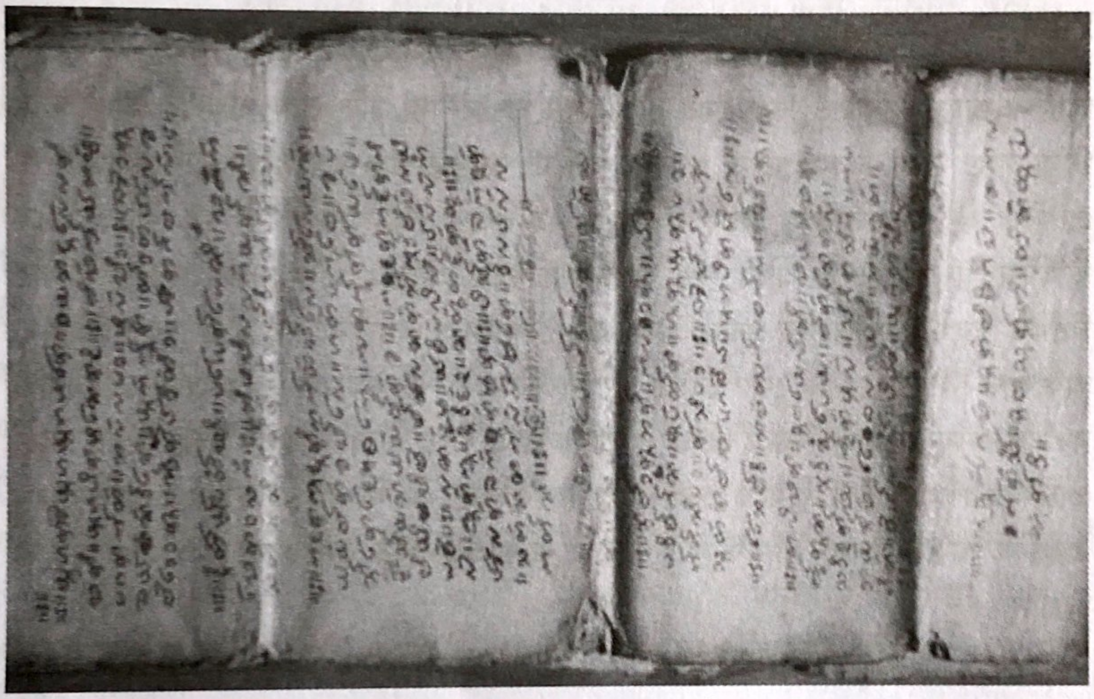


চিত্র ১. চাকমাদের আঙ মন্ত্র

অন্যদিকে কবি বা গীতি কবিদের দ্বারা রচিত চান্ধবী বারমাসী, মেয়্যাবী বারমাসী, আর পালার মধ্যে নরপুদি পালা, যুক্তপুদি, কমলা পুদি পালা সহ ইত্যাদি পালার পান্ডুলিপিগুলো দেখে জানা যায় চাকমা বর্ণ মালার প্রতি তাঁদের কিরকম প্রীতি আর মমত্ববোধ রয়েছে। তাছাড়াও এই সমস্ত পান্ডুলিপিগুলো পাঠ উদ্ধার করে জানা যায় চাকমা সমাজের ঐতিহাসিক শৌর্য্যবীর্য্যর কাহিনী এবং রোমান্টিক প্রণয় আর রসবোধের ধারা। যদিও তারা ব্যাকরণগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, এমনকি বাংলা বর্ণেও দক্ষ নন, তবুও তারা নিবিড়ভাবে মনের অগোচরে লালন করে গিয়েছেন নিজস্ব ভাষা ও বর্ণ। যাই হোক আলোচ্য প্রবন্ধে যখন অঝা বৈদ্যদের কথা লিখতে যাচ্ছি, সুতরাং একটু স্পষ্ট করে বললে বোধ হয় তাদের সম্পর্কে ধারণাটা পরিস্কার হয়ে যাবে।

চাকমাদের মধ্যে অনেক অঝা আছেন যেমন বুর পারা, থান মানা (গাঙ পূজা) চুমুলঙ অঝা ইত্যাদি অজা থাকলেও মূলত অঝা দুই প্রকার প্রথমত যারা পূজা পার্বন সহ বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্র ও তালিক শাস্ত্রের মাধ্যমে মানুষের নানা রোগ ব্যাধির চিকিৎসা করে থাকেন, তারা অঝা নামে সমধিক পরিচিতি। আর যারা ধাত্রী কাজে নিয়োজিত তারাও অঝা নামে পরিচিত এবং সাধারণত মহিলারাই এ কাজগুলো করে থাকেন। প্রথমোক্ত অঝরা প্রচুর তন্ত্র-মন্ত্র জ্ঞানের অধিকারী। প্রয়োজনে তারা ধাত্রীর ভূমিকা পালন করে থাকেন তখন যদি জরুরী মুহূর্তে মহিলা ধাত্রী (মহিলা অঝা) পাওয়া না যায়। তবে অনেকেই (পুরুষরা) ধাত্রীবিদ্যা চর্চা করেন না, তার কারণ ধাত্রীবিদ্যা মহিলা অঝাদের কাজ বলে।

এবার বৈদ্যদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক, তন্ত্র মন্ত্র ঝার ফুঁক ও তালিক শাস্ত্রের মাধ্যমে যারা বিভিন্ন রোগ ব্যাধির চিকিৎসা করে থাকেন তাদের বলা হয় বৈদ্য। সাধারনতঃ তারা বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্র ও তালিক শাস্ত্রের প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী। ফলে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা রাখেন। শোনা যায় অনেক বৈদ্যের এমন কতগুলো লিখিত কড়া তন্ত্র মন্ত্র আছে যে সেগুলো বাড়িতে রাখা যায়না। যার জন্য পুঁটলী বেঁধে কড়া তন্ত্র মন্ত্র লিখিত বইগুলো নিরাপদ জায়গায় রাখতে হয়। শোনা যায় সেই তন্ত্র-মন্ত্র গুলো গাছের নিচে রাখলেও নাকি গাছ যত বড় হোক না কেন ধীরে ধীরে সে গাছ মরে যায়।



চিত্র ২ ঃ হস্তলিখিত চাকমা বর্ণমালায় প্রাচীন তালিকশাস্ত্র

এই সমস্ত বিদ্যা সংরক্ষণের জন্য নানাবিধ অসুবিধার দরুন বৈদ্যদের মধ্যে অনেকেই এ বিদ্যা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন। আর যারা এ বিদ্যাগুলো সংরক্ষণে বা দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক তারা পরিপুর্ণভাবে পাচ্ছে না কিংবা বড় বৈদ্যরাও তাদের শিষ্যদের বিদ্যাগুলো হস্তান্তর করছে না। তার প্রধান কারণ এ কড়া বিদ্যা বা তন্ত্র মন্ত্রগুলো শিষ্যর হাতে গিয়ে পড়লে সেগুলো যে কোন সময় ব্যবহৃত হতে পারে বা অন্যের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। আবার অনেক বৈদ্যই তার উত্তরসূরী বা শিষ্যকে এ বিদ্যা দিয়ে থাকেন না এমনও কথা নয়। কিন্তু তা নির্ভর করে গুরু শিষ্যের মন মানসিকতার উপর।

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বৈদ্যরা বিশ্বাস করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজে আসবেনা। তাই তারা তাদের উত্তরসূরী বা শিষ্যদের দীক্ষা দেওয়ার সময়ে তন্ত্র-মন্ত্র গুলোর বানান ও উচ্চারণ মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে চাকমা বর্ণমালা বিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত আছে।

এইভাবে অঝা, বৈদ্য, লিপিকর, অনুলেখক গীতি কবি (গেঙখুলী) ও চারণ কবিদের কাছ থেকে চাকমা ভাষা ও বর্ণে রচিত বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র, পুঁথি, পালা গান, আখ্যান ভাগ ও প্রণয় কাহিনী রয়েছে যেগুলো চাকমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে উত্তীর্ণ।

আজ আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, অঝা বা বৈদ্যরা যদি গুরু পরম্পর ও শিষ্যের শিষ্য গড়ে তুলে চাকমা ভাষা ও বর্ণে লিখিত তাদের তন্ত্র মন্ত্র গুলো যদি হস্তান্তর বা প্রচারণা করতেন তাহলে বিংশ শতাব্দির এই প্রান্তে জোর গলায় বলতে পারতাম যে আমাদের নিজস্ব ভাষা আছে, বর্ণ আছে সাহিত্যও আছে। তাই চাকমা বর্ণ বা ভাষার লিখিত রূপের অস্তিত্বের জন্য অঝা বা বৈদ্যদের অবদান সবচেয়ে বেশী একথা অস্বীকার করার কোন জো নেই। যুগের বিবর্তন ও সময়ের প্রয়োজনে নবীনরাও বর্তমানের যুব সমাজ নিজস্ব ভাষা ও বর্ণের প্রতি ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে তারা প্রাচীনদের মত আর ঘুমিয়ে নেই। তাদের চেতনা ও নিরলস প্রচেষ্টায় একদিন নয় একদিন চাকমা ভাষা ও বর্ণ ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

পরিচিতি ঃ বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক।

আদিবাসী ভাষা বৈচিত্র্য

-অনির্বাণ বড়ুয়া

ভাষাই জীবন। ভাষা জীবনের কথা বলে। মানবজীবনের নিত্যসঙ্গী ভাষা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ মানবিক উপাদানটি ব্যতীত মানুষ মনের কথা ও ভাব প্রকাশ করতে পারে না। মুখের কথা ছাড়াও ইশারা-ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গিরও ভাষার অন্তর্গত। শুধু মানুষ নয়, সকল জীবজন্তু-বৃক্ষ-তরুরও ভাষা আছে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদেরও ভাষা আছে। সুতরাং মানবকুল তথা সমগ্র প্রাণিজগৎ নিজেদের প্রকাশের জন্য, নিজের অস্তিত্ব-উপস্থিতি জানান দিতে, প্রয়োজন-চাহিদা মিটাতে, সুবিধা-অসুবিধা জানাতে, প্রশ্ন করতে, আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রকাশে ভাষার উপর নির্ভরশীল।

মানবসভ্যতার অপরিহার্য উপাদান ভাষা। মানবজীবন ও মানবসংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ভাষা। ভাষা বহতা নদীর মতো প্রবহমান মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতিতে। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, প্রতি মুর্হূতে আমরা ভাষার ব্যবহার করে যাচ্ছি। তাই ভাষা ও মানবজীবন একে অপরের অচ্ছেদ্য পরিপূক। এবং ভাষাই মানুষের ভাবপ্রকাশের এক সহজাত মাধ্যম বা অবলম্বন, বিশেষত মাতৃভাষা। মাতৃভাষা যে কোনো মানুষের জন্য মায়ের দুধের মতো। মাতৃভাষা যে কোনো মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা এবং ইহা অনিবার্যভাবে মানুষের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে। একে মানবসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো জো নেই। মানবজীবন ও মানবিক সংস্কৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য ও নিরবচ্ছিন্নভাবে একাকার হয়ে আছে তার মুখের ভাষা।

শৈশবে প্রথমেই মানুষ তার মাতৃভাষা শিখে। মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে সবকিছুকে বুঝে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, জ্ঞান অর্জন করে এবং স্মৃতি ধারণ করে। যখন সে অন্য ভাষা শিখে, তখন নিজের মনের অজান্তেই ঐ ভাষাকে মাতৃভাষায় রূপান্তর করে বুঝার চেষ্টা করে। মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা জানা, শেখা এবং চর্চার প্রয়োজন আছে। মানবজাতির পরম সম্পদ, মানবসভ্যতা ও মানবসংস্কৃতির অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ ভাষা ভাবপ্রকাশ, যোগাযোগ, শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাধ্যম। সুতরাং ভাষা মানবতার এক পবিত্র অঙ্গ।

মুখের ভাষা ছাড়া জীবন-সমাজ-সভ্যতা অচল। সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতিতে ভাষার অবদান অসামান্য। নিজেকে প্রকাশ করার এই অদ্বিতীয় মাধ্যম নিয়েই মানুষ জীবনধারণ

করে। পৃথিবীতে মানুষের এত উন্নতি-অগ্রগতি ও জয়যাত্রার মূলে মূল শক্তির ভূমিকা রেখেছে ভাষা। ভাষাইতো পৃথিবীকে এতো কাছে টেনে এনেছে-মানুষে মানুষ সম্প্রীতির সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। ভাষাই যোগাযোগ। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে এতো আন্তরিকতা, সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন রচিত হয় ভাষার মাধ্যমেই। সমাজের প্রয়োজনেই ভাষার বিকাশ ও বিবর্তন ঘটে। সহজাত প্রকাশমাধ্যম মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে, সাবলীলভাবে, মনের মতো করে নিজের ভাব প্রকাশ করে থাকে। এতে সে পরম তৃপ্তি, শান্তি ও সাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষা আছে। এই ভাষাগত ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্যকে ভাষা-বৈচিত্র্য বলা যায়।

বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষা। পৃথিবীর প্রায় ৪১ কোটি মানুষ বাংলা ব্যবহার করে। ভাষা ব্যবহাকারীর দিক থেকে বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান পঞ্চম। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের সূর্যসন্তানরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্যে এবং মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথে জীবন উৎসর্গ করেছে। বিশ্ব-ইতিহাসে এ ঘটনা বিরল। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই-সংগ্রাম তথা ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনেই নিহিত ছিল আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজমন্ত্র। মহান ভাষা-আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই স্বাধিকার আন্দোলন এবং এর পথ ধরে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন 'স্বাধীনতা' পেয়েছি আমরা। সুতরাং আমাদের মাতৃভাষা বাংলাই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে- একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিস্তত্তার অভ্যুদয় ঘটিয়েছে- একটি লালসবুজের পতাকা এনেছে-বিশ্বমানচিত্রে একটি স্বকীয় স্বতন্ত্র স্থান করে দিয়েছে- একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে এখন সারা বিশ্ববাসী আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। বাংলা ভাষা বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়েছে-বিশ্বমানবতার হৃদয়ে আসন করে নিয়েছে। ইহা আমাদের জন্য অনেক বড় অর্জন। এ আমাদের জন্য গর্বের-গৌরবের। এ উজ্জ্বল অর্জনকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে রাখতে আমরা আমাদের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষার মর্যাদার দিকেও নজর দেবো। এ আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। তাহলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে-আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদাও অটুট থাকবে। বাংলাই আমাদেরকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছে।

বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল এলাকা মিলে প্রায় ৫৪ (চুয়ান্ন)টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ভাষা। ভাষাগত দিক থেকে আদিবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা। এই ভাষা-স্বাতন্ত্র্যই ভাষাবৈচিত্র্য। আদিবাসী জাতিসত্তা সমূহের এ ভাষাবৈচিত্র্য তাদের নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে-পাশাপাশি আমাদের মূল জনগোষ্ঠীর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। এ ভাষাগুলো আমাদের প্রাণসম্পদ-আমাদের গৌরবময় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। প্রতিদিন পৃথিবী থেকে অনেক ভাষা-উপভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এ ভাষাগুলোর উন্নয়ন-চর্চা-সংরক্ষণ-গবেষণায় বৈজ্ঞানিক, বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা চাই। এক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর অগ্রণী ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন। এ ভাষাগুলোর সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য আরো বিকশিত এবং সমৃদ্ধ হবে। কারণ এ ভাষাগুলোও আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আদিবাসীরা আমাদের বাংলাদেশেরই জনগণ-আমাদের সমাজেরই অংশ। তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের হাজার বছরের আবহমান চিরায়ত সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে; সমৃদ্ধ করেছে আমাদের দেশকে। বহু জাতিগোষ্ঠী, বহু ভাষা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি একটি দেশকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে-পরিপূর্ণতা দান করে। এই বৈচিত্র্যের মাঝেই একতা বা ঐক্যর সুর বাজে। আমাদের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে এ বৈচিত্র্য সহায়ক হয়। বৈচিত্র্যের মাঝেই ঐক্য আর মিল (Unity in Divesrity)। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাবৈচিত্র্যে আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমন্বয়বাদী বহুমাত্রিক জাতীয় সংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে এর চর্চা ও লালন আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী শিশু বা শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি তাদের আপন মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলন করা দরকার। এক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা কোর্স বা পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে করে তাদের মাতৃভাষা চর্চাও হবে, অপরদিকে বাংলা ভাষার চর্চাসহ তাদের নিজস্ব ভাষাগুলোর সাথে বাংলার একটি সুন্দর সংযোগ স্থাপিত হবে। তাদের নিজেদের মাতৃভাষা চর্চা এবং বাংলাচর্চা ফলপ্রসূ হবে। পাশাপাশি আদিবাসী ভাষা সমূহের উন্নয়ন, চর্চা, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী ভাষা ইনস্টিটিউট বা আদিবাসী ভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আদিবাসী ভাষার বর্ণমালা সংরক্ষণ ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে প্রকল্প হাতে নিতে পারে। আদিবাসী ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কম্পিউটারে আদিবাসী ভাষার বর্ণমালার আলাদা ফন্ট এবং কী-বোর্ড তৈরি করতে হবে। সাহিত্যকর্মগুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে অনুবাদের উদ্যোগ নিলে পাঠক উপকৃত হবে, সাহিত্যও সমৃদ্ধ হবে। তাহলে এগুলো আর হারিয়ে যাবে না। আদিবাসী ভাষার অভিধান রচনাও দরকার। এতে করে আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে বাংলা আর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের একটি মৈত্রীর সেতুবন্ধন রচিত হবে বিশ্বাস করি। আদিবাসী ভাষা ইনস্টিটিউটে এসব ভাষা শেখানোর কাজও চলতে পারে। এখানে পাঠাগার আর ভাষা বিষয়ক জাদুঘরও করা যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী ভাষার সাথে সাথে কাজও চলতে পারে। এখানে পাঠাগার আর ভাষা বিষয়ক জাদুঘরও করা যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী ভাষার সাথে সাথে বাংলার আর ইংরেজি ভাষার চর্চা-গবেষণাও হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট সমূহ (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও নেত্রকোনা) এক্ষেত্রে বড় ভুমিকা রাখতে পারে। আদিবাসী ভাষার সংগীত ও অত্যন্ত উন্নত এবং জীবনমুখী। এ গানগুলোর যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণ চাই।

স্বতন্ত্র ভাষা আদিবাসীদের নিজস্ব জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। ভাষা তাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক। সুতরাং ভাষা তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির এক অপরিহার্য উপাদান-অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আদিবাসী মানুষের এ ভাষাগুলোর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থাই হবে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন। মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের সে-ই শিক্ষা দেয়-এটিই অমর একুশের অবিনাশী চেতনা। আদিবাসী জনগণও বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতে পারে-এবং তারা সেটি করে থাকে। তাদের এ ব্যাপারে আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। বাংলা এবং ইংরেজি চর্চার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষার চর্চা আরো ব্যাপকতা লাভ করবে। তাদের নিজেদের ভাষার সমৃদ্ধি ঘটবে। এক ভাষার সাথে অন্য ভাষার বিনিময় হবে- সম্পর্কের নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে। সংস্কৃতি, মতাদর্শ ও চেতনার সমন্বয় হবে। মানুষের মানুষে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় হবে, আত্মার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন, মনিপুরী, খাসিয়া, সাঁওতাল, গারো, ম্রো, বম খিয়াং, পাংখোয়া, চাক, হাজং প্রভৃতি ভাষা এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা

হিসেবে প্রচলিত আছে। ভাষাগুলোর বর্ণমালা, শব্দভাণ্ডার, বাক্যগঠনরীতি, সর্বোপরি ভাষাশৈলী ও ব্যাকরণ উন্নত। ভাষাগুলোর সোনালী অতীত ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে বলে এগুলো এখানো টিকে আছে-বিভিন্ন জনধারায় প্রবহমান। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে। সেজন্য এদের উন্নয়ন, চর্চা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার চর্চা, সংরক্ষণ ও গবেষণা হবে। এখানে আদিবাসী ভাষা সমূহেরও উন্নয়ন, চর্চা, সংরক্ষণ ও গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। প্রয়োজন ও ভাষাগুলোর উপর জরুরিভিত্তিতে সমীক্ষা চালানো। প্রয়োজনীয় ও পদ্ধতিগত সমীক্ষা চালিয়ে তত্ত্ব, তথ্য, ব্যুৎপত্তি (উৎপত্তির ইতিহাস) সংগ্রহ করে আদিবাসী ভাষা সমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভান্ডার (Complete Database) তৈরি করা প্রয়োজন। এর জন্য আলাদা ওয়েবসাইটও থাকা প্রয়োজন আছে। আশার কথা, সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের আদিবাসীদের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। বাংলাদেশে এ ধরণের ভাষাতাত্ত্বিক জরিপের উদ্যোগ এটাই প্রথম। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ সমীক্ষার কাজ করবে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সমীক্ষা পরিচালনা করার মহতী পরিকল্পনা নিয়েছে। সেজন্য তাদের ধন্যবাদ। এ কর্মসূচির আওতায় আগামী এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষাবৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত তৈরি করবে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ভাষা-বিশেষজ্ঞদের মতে, বাঙালি জনগোষ্ঠী ছাড়া দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা ও তাদের ভাষা সম্পর্কে সঠিক এবং যথাযর্থ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হলে সকল বিতর্কের অবসান হবে। আদিবাসী ভাষার উন্নয়ন, চর্চা, সংরক্ষণ ও গবেষণায় এ সমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। জানা গেছে, আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের সব আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষাবৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত তৈরির সাথে সাথে তাদের জনসংখ্যা এবং উপভাষার তালিকাও তৈরি করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ এ ব্যাপারে বিস্তারিতি কর্মপরিকল্পনা (Detailed Plan of Project) তৈরি করবে। আদিবাসীরা কোন্ কোন্ ভাষা ব্যবহার করে, তাদের উপভাষা, এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার সম্পর্ক বা মিশ্রণ, বর্ণমালা, জাতিসত্তাগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা-পরিবারের বৃত্তান্ত এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। ***[প্রথম আলো; ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩]***

ইতিমধ্যে চাকমা, মারমা, ম্রো, বম সহ কয়েকটি আদিবাসী ভাষার ফন্ট উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কম্পিউটারে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি চাকমা ভাষার ইউনিকোড ফন্ট উদ্ভাবিত হয়েছে। মারমা, ম্রো ও বম ভাষার লিখন এবং মুদ্রণের কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। রোমান হরফে লেখা যাওয়ায় সফটওয়্যার ছাড়াই কম্পিউটারের কী-বোর্ড ব্যবহার করে বম ভাষা সহজেই লেখা যায়। ইতিমেধ্য ম্রো ভাষার বর্ণমালাও উদ্ভাবিত হয়েছে। চাকমা বর্ণমালা কম্পিউটারে লেখার সফটওয়্যার নির্মাণ করেছেন রাঙ্গামাটির জ্যোতি চাকমা ও সুজ মরিজ চাকমা। তারা চাকমা ফন্টকে ইন্টারনেটে লিখন-উপযোগী করে ইউনিকোডে রূপান্তরও করেছেন। এর জন্য তারা যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছেন। মারমা, ম্রো এবং বম ভাষার লিখন, মুদ্রণ নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করেছেন বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক মঙনু চিং মারমা। ম্রোদের ভাষা নিয়েও তিনি অনেক কাজ করেছেন। ম্রো ভাষার বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন বান্দরবানের মেনলে ম্রো। তবে এ ভাষার কম্পিউটার ফন্ট নির্মাণ করেন মেনরুম ম্রো। আদিবাসী ভাষা চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের এই ভূমিকা একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হয়ে থাকবে। ***[প্রথম আলো; ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩]***

সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সংস্কৃতিও অগ্রসরমান। সংস্কৃতির উন্নয়ন অগ্রতির জন্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লালনের জন্য, শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার জন্য, সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশের জন্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও চর্চার জন্য মাতৃভাষা এবং অন্যান্য জাতিসত্তার ভাষা চর্চা ও সংরক্ষণ আমাদের সবাইকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে। আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার চেতনা আজ সারা বিশ্ব ব্যাপৃত। বিশ্বব্যাপী সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার তাৎপর্য। আমাদের ভাষা দিবস আজ আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস চেতনাই আমাদের গৌরবান্বিত করেছে এবং বিশ্বসভায় আত্মমর্যাদাশীল জাতির স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। কাজেই এই মহান ভাষা আহ্বান-আসুন মাতৃভাষা বাংলা, আর্ন্তজাতিক ভাষা ইংরেজি এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সমূহের সুষ্ঠু চর্চা-সংরক্ষণ-গবেষণার মাধ্যমে আমরা একটি ভাষাবৈচিত্র্যের সমাজ বিনির্মাণ করি-যে সমাজে আমরা একতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, অগ্রগতি ও শান্তি খুঁজে পাবো প্রতিনিয়ত। জয় হোক সবার মাতৃভাষার। জয় হোক ভাষাবৈচিত্র্যের।

[পরিচিতি ঃ সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ, রাঙ্গামাটি।]

জাতির ভাষার ভবিষ্যত

- কর্মধন তন্‌চংগ্যা

ভূমিকা ঃ বিষয়টি কিভাবে শুরু করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ভাষা নিয়ে কিছু একটা লিখবো সে চেষ্টার ধারাবাহিক একটা অংশ হিসেবে এই আলোচনা। ভাষা হচ্ছে বায়ুবীয়, আপনি যেভাবে ধারণ করবেন ঠিক সেভাবে সে ধারণ করবে। ভাষার মৃত্যু এবং বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সব আপনার হাতে। প্রসঙ্গক্রমে একটা অবুঝ শিশু, যে এখনো কথা বলতে শিখেনি, সে যখন ফেল ফেল চোখে হেসে তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তখন তাদের মধ্যে একটা ভাবের বিনিময় হয়। এই ভাবের বিনিময়টাও একটা ভাষা, যাকে আমরা শিশুর মনের ভাব হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। শিশুর ভাষা আমরা সহজে বুঝতে না পারলেও সবাই কিন্তু তার মনের ভাবকে অনুভব করার চেষ্টা করে তার কোমল মনোভাবকে দেখে। শিশুটিও কিন্তু তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের ভাষা বুঝার চেষ্টা করে। যখন এই সম্পর্কের মধ্যে সে আপনত্বের একটা নৈকর্থ্য এবং ঐক্যতা খুজে পায় তখন সে হাসে। এই হাসিটাই কিন্তু শিশুর সাথে মায়ের মনের ভাব প্রকাশের বা সংযোগের একটা মাধ্যম। প্রসঙ্গক্রমে একটা বিষয় শেয়ার করছি, যেটি শুরুতে আমি ইঙ্গিত দিয়েছি- আমার শিশুর বয়স তিন প্লাস। আমরা তার সাথে নিজের (তন্‌চংগ্যা) ভাষায় কথা বলি। তবে আমরা যে বাসায় থাকি তার আশেপাশে ১০০% প্রায় অধিক বাংলাভাষী লোকের বসবাস। তাদের বাসায় আমার বাচ্চাটা যায় আর তাদের বাচ্চারাও আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে। তাদের সাথে আমার বাচ্চার প্রতিদিন দেখা হয়, কথা হয় একসাথে খেলাধুলাও করে। একদিন বাচ্চার সাথে তার মা (আমার মিসেস) শুদ্ধ বাংলায় কি একটা বিষয় জানতে চাইলে বাচ্চাটা বলে- 'তুই ম মা-মা, তুই বাঙাল নয়'/তুমি আমার মা, তুমি বাঙালী নয় (বাংলাভাষী)। আমি অফিস থেকে বাসায় ফিরলে তার মা বিষয়টি আমার সাথে শেয়ার করে। আমি কথাটা শুনে এক অদ্ভুত চিন্তায় পড়ে গেলাম। মনে মনে চিন্তা করলাম এতটুকু বাচ্চা কি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। যে বাচ্চাটা এখনো ভাষার লাল-নীল অর্থ, মাতৃভাষা বা মাতৃভাষার অধিকার সর্ম্পকে কিছুই জানে না সে বাচ্চার এই প্রতিক্রিয়া। আমাকে ভাবনার গভীরে ফেলে দিল। পরক্ষণে চিন্তা করলাম মায়ের ভাষার মধ্যে যে নৈকথ্য, মমত্বোবোধ, হৃদয়ের যে একটা প্রাকৃতিক সুর ভাজে সেটা হয়তো অন্য কোন ভাষায় ভাজে না। এই সুরটি হয়তো ছোট্ট অবুঝ বাচ্চাটি শুনতে এবং বুঝতে পেরেছে তাই এই প্রতিক্রিয়া। তার মায়ের ভাষার মধ্যে যে আপন একটা সুর বাজে অন্য কোন ভাষায় হয়তো সেটি বাজে না। যে ভাষার মাধ্যমে সে তার মা'র সাথে

কথা বলে খাওয়ার সময়, ঘুমিয়ে পড়ার সময়, ঘুম থেকে উঠার সময়। গোসল করার সময় এবং লেখাপড়া করার সময়ও। এমনকি সে যখন কান্না করে সে সময়ও। এই প্রত্যেকটা সময় সে তার মায়ের ভাষায় সাথে নিজের ভাষার একটা মিল খুজে পায় ভাষায়, বর্ণমালায় এবং শব্দে। মজার বিষয় বাচ্চাটা যখন পাশে বাসায় (অবগত করল) বেড়াতে যায় তখন সে আবার নিজের মতো করে তাদের সাথে বাংলায় কথা বলে। বিষয়টি শিরোনাম সর্ম্পকীয় হওয়াই একান্ত নিজস্ব পারিবারিক হওয়া সত্বেও লেখার মধ্যে নিয়ে আসা।

অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক- পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম অংশ হিসেবে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর সাথে তন্‌চংগ্যা ভাষাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের উপযোগী শিশু বান্ধব পাঠ্য বই তৈরী করা। তারা যেন বিদ্যালয়ে এসে ভাষার জন্য কোন সমস্যায় না হয় এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে। এই পাঠ্য তৈরী হবে নিজ সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ লোকজনের অংশ গ্রহণে। শিশুরা প্রতিদিন নিজের আশেপাশে যেসব উপাদান বা উপকরণ দেখে দেখে বড় বা পরিচিত হচ্ছে সেসব উপকরণই হবে এই বইয়ের মূল পাঠ্য। তার কারণ শিশুরা যাতে স্কুলে এসে পাঠ্য বইয়ে তার চেনা-জানা পরিবেশকে খুঁজে পায়। আর এই খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সে যেন আনন্দের সহিত বিদ্যালয়ে আসে এবং শিক্ষা লাভ করতে পারে। এই পাঠ্যর মধ্যে আছে গল্প, ছড়া, বর্ণমালার এবং অংক শেখার বই। সবগুলি তন্‌চংগ্যা ভাষায়। ১৬ই সেপ্টেম্বর/২০১০ইং সালে অনেক আগ্রহ নিয়ে তন্‌চংগ্যা জাতির বহু প্রতিক্ষিত 'এঙ বই' নামে প্রথম বর্ণমালার বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু মোড়ক উন্মোচন হওয়ার পরপরই 'কিছু জায়গায় ভুল আছে' এই অজুহাতে ভাষা কমিটির আপত্তির কারণে শিশুদের মাঝে বইটি বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিশুদের মাঝে বইটি পৌঁছে দিতে না পারা এবং তাদের বর্ণমালা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার দায় তন্‌চংগ্যা ভাষা কমিটি কিছুতে এড়াতে পারেনা। ভাষা কমিটি এই বর্ণমালা বইটি তৈরীর পেছনে কিন্তু দিন-রাত পরিশ্রম করেছে। তবে আমার বোধগম্য হয় না- ভাষা কমিটি বইটি তৈরীতে পরিশ্রম করল আর প্রকাশিত হওয়ার পরপরই বইটি বিতরণ না করে কেন বা বন্ধ করে দিল। বিষয়টি অবশ্যই ভাষা কমিটি ভালো জানেন। যদি এই বইয়ে কোন ভুল থেকে থাকে কি ভুল, কোথায় ভুল হয়েছে সেটি চিহ্নিত করার দায়িত্ব ভাষা কমিটির। সাথে সংশোধনেও দায়িত্ব তাদের, কিন্তু সেটি হয়নি। সেজন্য আমি মনে করি জাতির প্রত্যাশা পূরণের তন্‌চংগ্যা ভাষা কমিটির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। আর এর দায় পড়ে ভাষা কমিটি প্রধান হিসেবে আহবায়কের উপর। ভাষা ও বর্ণমালা

শিক্ষার প্রতিবন্ধকতার একটি উদাহরণ হিসেবে এটি পড়ে। আর এজন্য তাদের জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে কিনা প্রশ্ন থেকে যায়। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৪১৯ ফাল্গুন বাংলা 'তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা শিক্ষা/Tanchangya Primer' নামে একটি বর্ণমালা শিক্ষা বই প্রকাশ করা হয় (প্রথম বইয়ের ভুলের সংশোধনী হিসেবে)। আমি যতদূর জানি এই বইটিও তন্‌চংগ্যা শিশুদের হাতে পৌঁছায়নি। কারণ এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগে মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমটা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বারের মতো তন্‌চংগ্যা শিশুরা বর্ণমালা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এর দায়ও কিভাবে ভাষা কমিটি এড়াবে 'নিজেদের পছন্দ মতো' করে বইটি প্রকাশ করার পরও। পরে জেনেছি (ভাষা কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে) প্রথম বর্ণমালা (এঙ বই) বইয়ে তন্‌চংগ্যা ভাষা কমিটির উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ২/১ সদস্যের ইচ্ছে হয়েছিল একটা মুখবন্ধ দেওয়ার। এই মুখবন্ধ না দেওয়ার কারণে "এঙ" বইটি কৌশলে (ভুল আছে বলে) বন্ধ করে দেওয়া হয়। জানিনা এর মাধ্যমে কার কি স্বার্থ আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে শুধু নিরবে দেখেছি একটি জাতির স্বপ্নকে ভেঙ্গে যেতে। আমার এই আলোচনা মাধ্যমে জাতিও হয়তো সেটি উপলব্ধি করবে। জাতির এই স্বপ্ন ভঙ্গের মধ্য দিয়ে একটি 'জাতির ভাষার ভবিষ্যত' হুমকি হিসেবে আমি দেখছি, তাই অনিচ্ছা সত্বেও বিষয়টি আমার লেখায় নিয়ে আসা। কেননা এর মধ্যে চেষ্টা, স্বপ্ন এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা বর্তমান। তন্‌চংগ্যা শিশুরা যেহেতু বারংবার সুযোগ পেয়েও বর্ণমালা শিক্ষা পায়নি তাই তাদের বর্ণমালা শিক্ষা বিষয়ে কি করা যায় ভাষা কমিটিকে সে বিষয়টি ভাবতে হবে সাথে দায়িত্বও নিতে হবে। কারণ আমি যতটুকু জানি ভাষা কমিটি গঠন এর মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে তন্‌চংগ্যা ভাষা উন্নয়নে কাজ করা এবং সরাসরি সহযোগিতা করা। তন্‌চংগ্যা বর্ণমালা এবং ভাষা নিয়ে তাদের গবেষণা বিষয়টিও ভাবতে হবে। তন্‌চংগ্যা ভাষা এবং বর্ণমালাকে কিভাবে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা দরকার। বর্ণমালা শিক্ষার জন্য পাড়া ভিত্তিক কিছু প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া যেতে পারে। সেজন্য ভাষা কমিটির সদস্যরা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এই দায়িত্ব হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী। তবে প্রয়োজনে তন্‌চংগ্যা ছাত্র-ছাত্রী মধ্য থেকে যাদের আগ্রহ আছে তাদেরকেও প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তাদের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্ণমালা ব্যবহার (কথ্য এবং লিখিত রূপ) ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা তৈরীতে ভাষা কমিটি উদ্যোগ নিতে পারে, এর মধ্যে থাকবে বর্ণমালা এবং ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহার। থাকবে আরো তন্‌চংগ্যা ভাষার শুদ্ধ বানান চর্চার উদ্যোগ। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি তন্‌চংগ্যা ভাষা ব্যবহার ক্ষেত্রে গছাভিত্তিক ভাষার বৈচিত্র্যতা তন্‌চংগ্যা ভাষাকে সমৃদ্ধ করলেও লিখিত রূপ ব্যবহার ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়। কোন শব্দটা বা বানানটা আমরা লিখব সে দোদুল্যমানের মধ্যে পড়ে যাই।

সেজন্য আমি মনে করি লিখিত রূপের জন্য সুনির্দিষ্ট একটা ফর্ম দাঁড় করানো দরকার। যেমনটি বাংলা ভাষায় প্রমিত বানান এবং ব্যবহার নীতি আছে। এই বানান চর্চার মাধ্যমে তন্‌চংগ্যা ভাষার মধ্যে একটা প্রাঞ্জলতা বা স্থিরতা চলে আসবে এবং বানান চর্চার ক্ষেত্রে একটা সাম্য বা ঐক্যটা তৈরী হবে। সেটি অবশ্যই দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়া, তবে ভবিষ্যতের জন্য ভেবে রাখা যেতে পারে। আমাদের এগিয়ে আসতে হবে ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে। তন্‌চংগ্যা ভাষা ও বর্ণমালা চর্চার মাধ্যমে সমাস, ক্রিয়ার কাল, বিভক্তি, পদ, লিঙ্গ, বচন, ধাতুসহ নানা বিষয়কে আমাদের সামনে আনতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে যুক্তব্যঞ্জন, কার, ফলা নিয়ে। তন্‌চংগ্যা বর্ণমালায় বর্তমানে ৩১ টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ০৫টি স্বরবর্ণ ব্যবহার থাকলেও আরো কিছু বর্ণ সংযোজন করা যায় কিনা যেগুলি আমাদের বৈদ্য বা কবিরাজরা বহুদিন থেকে ব্যবহার করছেন এবং যে বর্ণগুলির মধ্যে আমাদের ঐতিহ্য বর্তমান। তবে নতুন বর্ণ তৈরী নয়। যে বর্ণটি আমাদের কথ্যরূপের সাথে আছে কিন্তু লিখিত রূপের সাথে নেই সেরকম যদি কোন বর্ণ থেকে থাকে ভাষা কমিটির উচিত সেগুলি চিহ্নিত করে প্রচলনের ব্যবস্থা করা। তার জন্য যদি বর্ণমালা সফটওয়ারকে আফডেট করতে হয় তার ব্যবস্থা করা।

এই আফডেটের অংশ হিসেবে তন্‌চংগ্যা বর্ণমালার 'ইউনি কোড' নিয়েও ভাবা যেতে পারে। তাহলে আমরা নেটে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তন্‌চংগ্যা ভাষাকে চর্চা করতে পারবো। ভাষা নিয়ে নানা প্রকাশনা বের করারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সেমিনার আয়োজনের করা যেতে পারে। আরো একটি প্রস্তাব থাকবে প্রয়োজন হলে তন্‌চংগ্যা ভাষা কমিটি পূর্ণগঠন করা যায় কিনা। আর এই পূর্ণগঠন ক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রয়োজনে নয় (মুরুব্বী/গছা/লিঙ্গ) যারা জাতির জন্য কাজ করবে এবং আগ্রহ আছে তাদেরকে সদস্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আর ভাষা কমিটিকে একটি পুনাঙ্গ সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। মূল কথা হচ্ছে ভাষা কমিটির একটি গঠনতন্ত্র থাকবে এবং এই গঠনতন্ত্রের একটা সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকবে, সেখানে ভাষা কমিটির কাজ কি হবে তারা কি কাজ করবে এর ভিতর থাকবে জবাবদিহতার বাধ্যবাদকতা। সাথে আরো একটি প্রস্তাব থাকবে ভাষা কমিটিকে তাদের ভালো কাজে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি অদায়িত্বশীল কাজে জবাবদিহিতা বিষয়টিও নিশ্চিত করা দরকার।

ভাষা বিক্রি বা বির্সজন হয়ে যায় ভাষার কাছে। দুটি কারণে সেটি হতে পারে বসবাসগত এবং বৈবাহিক সূত্রে। এই দুটি কারণে তন্‌চংগ্যারা (সবাই না) তাদের ভাষাকে খুব সহজে বির্সজন দেয়। এই বির্সজনের সুযোগটা অনেকাংশে আসে আমাদের শিক্ষিত প্রজন্ম থেকে; যারা নিজেদের আধুনিক ভাবাপন্ন মনে করে (সম্ভবতঃ)।

অন্যরা যদি নিজের মাতৃভাষাকে চর্চার করার সুযোগ রাখে তাহলে আমরা পারবো না কেন। এখানে লজ্জা নামক বস্তুটি থাকার কথা নয়। সে প্রশ্নটি আমরা প্রত্যেকে হৃদয়ে ধারণ করবো। আমি কেন আমার ভাষাকে বিসর্জন দিব। বিষয়টি আশ্চার্যবোধক হলেও তন্‌চংগ্যা কমিউনিটির জন্য এটি অনেকটা সত্য। বিশেষ করে শিক্ষিত প্রজন্মের মধ্যে এই প্রবণতাটুকু একটু বেশী লক্ষ্যনীয়, যেটি পূর্ণবার বলছি। অন্যরা যদি তাদের ভাষা নিয়ে অহংবোধ করতে পারে তাহলে আমরা কেন পারবো না। আমি কেন আমার বাচ্চার সাথে ঘরে এবং ঘরের বাইরে অন্য একটা ভাষায় কথা বলবো, নিজের সুন্দর একটা মাতৃভাষা থাকা সত্বেও। কেউ যদি মনে করেন সেটি আধুনিকতা বা মর্ডান তাহলে আমি বলব সেটি তার সীমাবদ্ধতা। গবেষণায় বলছে- সবার আগে নিজের মায়ের ভাষা। কোন শিশু যদি নিজের ভাষাটা না জানে তাহলে অন্য একটা বিদেশী ভাষা সে কিভাবে আয়ত্ব করবে। তবে একটি বিষয় বলে রাখি ভাষা চর্চা (অনেক ভাষা জানা) আর নিজ ভাষা বির্সজন দিয়ে অন্য ভাষা চর্চা করা কিন্তু এক বিষয় নয়। আপনি অর্থনীতি ল্যাংগুয়েজ হিসেবে অনেক ভাষা চর্চা করতে বা জ্ঞান রাখতে পারেন সেটি অন্য বিষয়। কিন্তু ভাষা চর্চার আধুনিকতা নামে নিজের মায়ের ভাষাকে বিসর্জন দেওয়া আদৌ যুক্তির মধ্যে পড়ে না। ভাষা বিকৃতি জাতির সংস্কৃতির অহংবোধকে নষ্ট করে দেয়। জাতির মূল্যবোধকে প্রশ্নাতীত করে তুলে।

উপসংহার ঃ ভাষার বিষয় নিয়ে লেখা বলে এই বিষয়গুলি শেয়ার করা। কারণ এর সাথে তন্‌চংগ্যা ভাষার ভবিষ্যত জড়িত। আমার এই লেখা জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, যাদের নিয়ে এই দেশ, সমাজ এবং জাতি স্বপ্ন দেখে। আগামীর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সমাজ ও জাতি উন্নয়নে তাদের যেন কোন বাধা না আসে। কারণ সমাজের কিছু মানুষদের আত্মস্বার্থের কাছে তাদের সংগ্রাম এবং স্বপ্ন যেন অপমৃত্যু না ঘটে আর তাদের তারা যেন খুব সহজে চিনতে পারে। তাই এই ভবিষ্যৎ কারিগরদের কাছে আমি আমার এই স্বপ্নফেরী হয়ে এই লেখা। কারণ আমার তন্‌চংগ্যা ভাষা যদি বেঁচে না থাকে তাহলে জাতি হিসেবেও আমারও বেঁচে থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। তাই ভাষা বেঁচে থাকার উপর নির্ভর করছে আমার জাতির অস্থিত্ব বেঁচে থাকা। প্রতিনিয়ত পৃথিবী থেকে যে ভাষার বিলুপ্তি বা অপমৃত্যু ঘটছে তাদের দলে আমার মায়ের ভাষা 'তন্‌চংগ্যা ভাষা'র নাম যেন না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদেরই। অন্য কেউ কোনদিন দায়িত্ব নিবে না, দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই। 'আমি আমার মায়ের ভাষায় কথা বলবো' এই শ্লোগান এবং অভিব্যক্তি হোক আমাদের ভাষা রক্ষার।

পরিচিতি ঃ কবি ও সাহিত্যিক, ওয়াগ্গা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

পাহাড়ি সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের নির্ধারকসমূহ

- মুক্তাশ্রী চাকমা সাথী

নারী মা, কন্যা, স্ত্রী, বোন, প্রেমিকা। নারী মোহিনী, কোমল, রহস্যময়ী। নারী ধৈর্যশীলা, নারী সংস্কৃতির ধারক বাহক। আমাদের মাঝে এমন এক ধরনের ভাব আছে যেন, এমন উপাধিতে নারীদের ভূষিত করে আমরা নারীদের নারীত্বের প্রতি ভীষণ সম্মান করে থাকি। আসলেই কি তাই? নারীর কি মা, কন্যা, বোন, স্ত্রীর বাইরে কোন পরিচয়ই থাকে না? নারী কি কেবল নারীত্বের পরিচয় ধারণ করে থাকে? তার মানুষ হিসেবে পরিচয়, কি কোন মানেই রাখে না? যেমন করে অন্য লিঙ্গের মানুষের থাকে? যেমন ধরুনঃ সমাজের একটি অতি প্রচলিত চিত্র হলো, একজন পুরুষ সে পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর পাশাপাশি আরও অনেক কিছু- সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে। সমাজে, রাষ্ট্রে পুরুষের কথার মূল্য আছে, তা সে পড়ালেখা জানা সুশিক্ষিত বা স্বশিক্ষিত হোক আর না হোক। নারী সুশিক্ষা, স্বশিক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও, তার কথার দাম পুরুষের মত মূল্যায়ন পায় না। এখনও দুঃখজনকভাবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একজন মাতাল, আদর্শহীন, চরিত্রহীন পুরুষের কথার মতামত, একজন স্বাবলম্বী মেয়ের মতামতের চেয়ে বেশী মূল্য রাখে।

চিত্রের উল্টোদিকে যদি আমরা দেখি, কোন কোন ক্ষেত্রে-সমাজে নারীর কথার মূল্যায়ন আছে বৈকি। কিন্তু, সেই সব নারীরা কারা? একটু লক্ষ্য করলেই, আমরা দেখতে পাবো, সেই সব নারীরা মূলত তারা যাদের কাছে "ক্ষমতা" আছে। যেমন ধরুন, পাহাড়ি সমাজে নবাগত চাকমা রানী, যিনি এখন নারী অধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে কাজ করা শুরু করেছেন, তাঁর কথার কিছু মূল্যায়ন সমাজের কাছে সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। অথবা, আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে আসছি, আমাদের যেহেতু ক্ষমতায় থাকা/ জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ/সুশীল সমাজের সাথে এক ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে-আমাদের কথারও কিছু কিছু মূল্যায়ন আমরা সমাজের কাছে পেয়েছি/পাচ্ছি, অথবা আদায় করে নিয়েছি/নিচ্ছি।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে- সমাজে যে সমস্ত নারীরা তথাকথিত "ক্ষমতাবান" তাঁদের কথার মূল্য, সমাজের কাছে আছে। যাদের ক্ষমতা নেই, তারা যতই ভালো কথা বলুক না কেন, তাঁদের কথার দাম দিতে আমাদের মানে লাগে। আমরা মনেকরি, তাদের কথা যদি আমরা ধারণ করি, পালন করতে চাই, তাহলে, আমাদের "স্ট্যাটাস" কমে যাওয়ার

আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কা থেকেই, উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, পরিবারে স্বামী স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব দেননা, ছোট ভাই বড় বোনের মতামতকে গ্রাহ্য করেন না (যেহেতু ক্ষমতার স্কেলে পুরুষ ক্ষমতাবান, নারী ক্ষমতাহীন)। আবার শ্বাশুরি পুত্রবধূর উপর ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটান (যেহেতু ক্ষমতার স্কেলে শ্বাশুড়ি পুত্রবধূর তুলনায় বয়স ও সম্পর্কের জোরে উপরে অবস্থান করেন।) আমাদের আশে-পাশে একটু চোখ খোলা রাখলেই এমন আরও অনেক অনেক সম্পর্ক আমাদের সবার চোখে পড়বে।

সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে, নারীর কথার মূল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে নারীটি কতটুকু ক্ষমতার ধারক- তার উপর। অপরদিকে, পুরুষের মতামতের মূল্য শুধুমাত্র "ক্ষমতা "নয়, এর পাশাপাশি অনেকাংশেই তাঁর লিঙ্গভিত্তিক পরিচিতির উপরও নির্ভর করে।

এ কারণেই নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ নজর আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দেওয়া জরুরী। কিন্তু একি সাথে এটাও মাথায় রাখা জরুরী, নারীর ক্ষমতায়নের নামে আমরা শ্রেণি বৈষম্য তৈরিতে ভূমিকা রাখছি কিনা। নারীরই ক্ষমতায়নের মানে এই নয়, শুধু সংখ্যাগত ভাবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। গুণগতমান নিশ্চিত করাটাও অতি অতি জরুরী বিষয়। যেখানে, শুধুমাত্র ক্ষমতার ধারক মানুষের কথার মূল্য থাকে, সাধারণ নারীদের/ পুরুষের/তৃতীয় লিঙ্গের তথা সাধারণ মানুষের নয়, তা আমার কাছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই একটি রূপ। তা সেখানে যত সংখ্যক নারীই ক্ষমতায় থাকুক না কেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মানেই হচ্ছে, এমন সমাজ ব্যাবস্থা যেখানে, ক্ষমতাহীন (যাদের মধ্যে নারীও আছে,) তাঁদের প্রয়োজন, অধিকার এবং মতামতের প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

নারীর ক্ষমতায়নের মানে আমরা যদি শুধুমাত্র নারীদের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করা, শুধুমাত্র ক্ষমতাই থাকা নারীদের কথার মূল্যায়ন আছে তাই মনে করি, তাহলে তা সমাজে, রাষ্ট্রে এবং ব্যাক্তি জীবনে সুফল বয়ে আনবে না বরং অন্য একটি নতুন সমস্যার জন্ম দেবে। তাহলে আমাদের কি করা দরকার? আমার সীমিত জ্ঞানে আমি যা বুঝি তা হলো, আমাদের এখন নারীর সংখ্যাগত ক্ষমতায়নের পাশাপাশি, গুণগত দিকেও নজর দেয়া উচিত। সর্বোপরি, সমাজে যে সকল পুরুষ এখনও ভাবে, নারীরা কিছুই বুঝেন না, নারীদের নিজের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এখনও পরিবারের বাবা, ভাইয়ের মতামতের উপরই নির্ভর করে, এবং কোন নারীকে "খারাপ মেয়ে" তকমা দিয়ে সামাজিক ও শারীরিকভাবে হেনস্তা করার অধিকার সমাজের ক্ষমতাবানদের (পুরুষ) আছে, তাঁদের মধ্যে নারীর অধিকার, নারীর মানুষ হিসেবে অধিকারের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আমি একজন নারীবাদী। এবং এই নারীবাদী হওয়ার পিছনে পড়া-লেখায় আমাকে শিখিয়েছে, নারীবাদ ক্ষমতার আড়ালে থাকা মানুষের দ্বারা আমার (ক্ষমতাহীনদের) জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিপরীতে আমাকে লড়াই করতে শেখায়। তা সে ক্ষমতায় থাকা পুরুষ, নারী, সমাজ, রাষ্ট্র যেই হোক না কেন।

দিন শেষে, আদিবাসী সে পুরুষ, নারী অথবা তৃতীয় লিঙ্গের যাই হোক না কেন- ক্ষমতার স্কেলে রাষ্ট্রের কাছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে অতি নিচে। আদিবাসী অধিকার আদায়ে এ কারণেই-আদিবাসী সকলের সমানভাবে অংশগ্রহণ যেমনভাবে আমরা রাষ্ট্রকে বলছি, বাঙ্গালি জাতির পাশাপাশি এই দেশে আদিবাসী অনেক জাতিগোষ্ঠী আছে, তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন প্রথা আছে, ঠিক তেমনি ভাবে আদিবাসী পুরুষ এবং আদিবাসী সমাজে ক্ষমতায় থাকা মানুষগুলোর মনে রাখতে হবে-আদিবাসী নারীরাও মানুষ এবং একজন আদিবাসী পুরুষের যা যা করার অধিকার আছে, একজন আদিবাসী নারীরও তাঁর প্রয়োজনকে মাথায় রেখে মানুষ হিসেবে তা করার অধিকার আছে। কারণ, আত্মমর্যাদা নিয়ে সক্ষমতার পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করার অধিকার সকলের। এই অধিকার আমাদের কাছে এখনো স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে হলে, আদিবাসী, বাঙ্গালি, পাহাড়ি, নারী, পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গ সকলে মিলেই হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

লেখিকা পরিচিতিঃ

মুক্তাশ্রী চাকমা সাথী একজন সাংবাদিক, কলামিস্ট, গবেষক এবং অধিকার কর্মী যিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নারী, শিশু, জেন্ডার ও আদিবাসী অধিকারের জন্য বিগত ১৫ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দেশে বিদেশে ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- UNICEF পুরস্কার সাংবাদিক হিসেবে, সুইডেন সরকার কতৃক "Young Connector of Future" তাঁর অধিকার বিষয়ে কাজের ক্ষেত্রে। তিনি বাংলাদেশের প্রথম আদিবাসী নারী যিনি জাতিসংঘের আদিবাসী ফেলোশিপ পেয়েছেন। তিনি তাঁর নারী অধিকারের কাজের জন্য SANGAT, A South Asian Feminist Netwrok এর বাংলাদেশের কোর গ্রুপ মেম্বার হিসেবে কাজ করছেন।

পাহাড়ের প্রশ্নে বাংলাদেশের বোবা-কালা-কানা মিডিয়া

-পাইচিংমং মারমা

মনে করেন, মন্ত্রণালয়- সচিবালয়ের মন্ত্রী-আমলারা বিদেশী কোম্পানীর কাছে কমিশন খেয়ে সুন্দরবন পুড়িয়ে ফেললো... না, পুড়িয়ে নয় ঠিক, এমন কিছু হলো যাতে সুন্দরবনটা ধ্বংস প্রায় হয়ে গেলো। বনের সাথে সাথে বনের মানুষ, প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ সব ধ্বংস হয়ে গেলো। সরকার সেটা টের পেয়ে করলো কি আওয়ামীলীগের দশ বছরপূর্তির বর্ষফুর্তিতে মানুষকে মজিয়ে রাখতে জাতীয় ফূর্তি সপ্তাহ ঘোষণা করলো। শাহরুখ খান এসে গেরুয়া রঙের রঞ্জনে পাবলিকের মনোরঞ্জন করে গেলো। কারিনা আর জরিনা এক মঞ্চে নেচে দেশের মানুষকে সুন্দরবনের ধ্বংসযজ্ঞের কথা ভুলিয়ে দিলো। সরকার গোপনে গোপনে সব পত্রিকাকে সুন্দরবনের নিউজ কাভার করতে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করলো। ডিজিএফআই এর গোয়েন্দারা অনলাইন-অফলাইন সব পত্রিকা অফিসে শাসিয়ে গেলো, সুন্দরবনের নিউজ হলে সুন্দরী গাছ তোদের পাছা দিয়ে ঢুকানো হবে। শুধু সরকারের বর্ষফূর্তির খবর ছাপাবি।

একদিন ঠিকই মানুষ জেনে গেল কিন্তু তখন জেনে আর কিছুই করার থাকলো না। এই যে পত্রিকা, ম্যাগাজিন, নিউজ চ্যানেল, টিভি, ইন্টারনেট সহ সব মিডিয়া সুন্দরবনের খবরটা চেপে গেলো একে মিডিয়া ব্ল্যাক আউট বলা হয়। সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে বলা হয় সেন্সরশিপ। আর মানুষের মনযোগ অন্যদিকে প্রবাহিত করা- মানে শাহরুখ খানদের এনে মৌজ-মাস্তি করানোটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশান/ ডাইভার্শান।

মাটিরাঙ্গায় আদিবাসীদের উপর বাঙালি সেটেলারদের হামলার খবরটা এভাবে মিডিয়া ব্ল্যাক আউট আর রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপের শিকার হয়েছে। এর ফলে কি হলো? এর ফলে একটা জাতিগত হামলার রেকর্ড কোথাও আর থাকলো না। যদি কোথাও ছাপা হতো তাহলেও খুব একটা রকমফের হতো না। মানুষ ঐ খবরে একবার নজর বুলিয়ে বলতো, "ও আচ্ছা, কতিপয় দুর্বৃত্ত কিছু বাসযাত্রীদের নামিয়ে পিটিয়েছে? আহারে... আমরা কবে যে সভ্যতা শিখবো!" যদি ছাপা হতো তাতে অনেক কিছুই চাপা হতো। মানে অনেক কিছু চেপে-অনেক পরিকল্পিত শব্দ চয়ন করে তবে ছাপা হতো। সেই প্রতিবেদনে এই হামলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকতো না। মানুষের মনে প্রশ্ন তৈরি হতো না। প্রশ্নগুলো কেমন?

-মাটিরাঙ্গায় কারা মারলো আর কারা মার খেলো?

- মারলো বাঙালিরা আর মার খেলো পাহাড়িরা।

-কেন এমন জাতিগত হামলা হবে? ঘটনার সূত্রপাত কোথায়? ঘটনার শুরুতে কি জাতিগত বিদ্বেষের কোন সূত্র আছে? পাহাড়িরা কি বাঙালিকে 'বাঙালি' হবার কারণে মেরেছে?

- না, ঘটনার শুরুতে জাতিগত বিদ্বেষের কোন উপাদান নাই। একজন ভাড়াটে মোটর সাইকেল চালকের লাশ পাওয়া গেছে। হত্যাকারী কে কেউ জানে না। হত্যার মোটিভ হতে পারে ব্যক্তিগত আক্রোশ, হতে পারে ভিকটিম দুইদিন আগে আওয়ামিলীগের অন্তর্কোন্দলের শিকার, হতে পারে ডাকাতির পর খুন... এই খুনের ঘটনাকে পরিকল্পিতভাবে জাতিগত বিদ্বেষে রূপ দেওয়া হয়েছে। কেন বাঙালি মরবে এই অভিযোগে রাস্তায় যে পাহাড়িকে দেখা গেছে তাকেই পেটানো হয়েছে। তা বাঙালির লাশ পাওয়া গেলেই কি রাস্তায় খুঁজে খুঁজে পাহাড়ি মারতে হবে নাকি? পাহাড়িরাও কি তাই করে?

- না। জাতিগত দাঙ্গার উস্কানি দিয়ে পাহাড়িরা বাঙালিদের লোকালয়ে হামলা চালিয়েছে আজ পর্যন্ত এমন কোন নজির পাওয়া যায় নি। প্রত্যেকটি হামলা ঘটনা পাহাড়িদের লোকালয়ে ঘটেছে, বাঙালিদের লোকালয়ে নয়- এটাই প্রমাণ করে যে পাহাড়িরা কেউ গিয়ে বাঙালিদের পাড়ায় হামলা করে না। বাঙালিরাই এসে হামলা চালায়।

-এটাকে কি হামলা বলা যাবে নাকি জাতিগত দাঙ্গা বলতে হবে?

-জাতিগত দাঙ্গায় দুই পরে সমানেসমান সহিংসতা থাকে। এখানে সব ক্ষেত্রেই বাঙালিরা কোন না কোন প্ররোচনায় গিয়ে পাহাড়িদের হামলা করে।

-পুলিশ-প্রশাসন-আর্মি কি করে? প্রতি ১০ জন সিভিলিয়ানের বিপরীতে একজন করে আর্মি আছে ওখানে। আর্মড পুলিশ-বিডিআর আর বেসামরিক বাহিনী সহ ধরলে তো প্রতি ৫ জনে একজন ফোর্সের" লোক আছে। তাদের কাজ কি?

-তাদের কাজ রাষ্ট্রের পলিসি বাস্তবায়ন করা। তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময় নিরব থাকা, আক্রমণে উস্কানি দেওয়ার ভুরি ভুরি নজির আছে। কাউন্টার ইনসারজেন্সির সময়ে এই বাহিনীর সদস্যরাই আদিবাসী নিধনের সাথে জড়িত ছিলো। আর সেটেলারদের আনসার-ভিডিপি বাহিনীর ট্রেইনিং দেওয়া হয়েছে। সেটেলারদের দিয়েই আনসার-ভিডিপি বাহিনী বানানো হয়েছে। গণহত্যায় সরাসরি অংশ নিয়েছে সেটেলাররা। আদিবাসীদের মাটিতে এখন তারা থাকে। এভাবেই আদিবাসী অধ্যুষিত অরণ্য-জনপদ এখন সেটেলারদের গ্রাম-বাজার হয়েছে। এখন তারাই সংখ্যাগুরু আর

পাহাড়িরা লঘুতর এবং ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

-মাটিরাঙ্গার মতো ঘটনা কি এইবারেই প্রথম হয়েছে না আগেও হয়েছে?

-এমন ঘটনা প্রায়ই হয়। যেহেতু আদিবাসীরা সব ভেতরে পাহাড়-জঙ্গলে থাকে আর সেটেলাররা থাকে শহর-হাট-বাজারে সুতরাং কোথাও বিন্দুমাত্র উস্কানি পেলেই তারা রাস্তার যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে আদিবাসী-পাহাড়িদের বের করে হামলে পড়ে। ২০১০ সালে জালিয়াপাড়ায় এভাবে হামলার ঘটনা মিডিয়ায় এসেছিলো। এবারের ঘটনা মিডিয়া বেমালুম চেপে গেছে। সামনের দিনে মিডিয়া ব্ল্যাক আউট আর সেন্সরশিপ আরও ভয়ংকর হবে। জালিয়াপাড়া হামলায় রক্তাক্ত মেয়ের ছবি এখনো গুগলে খুঁজলে পাওয়া যাবে। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। -হুম তাহলে এটা 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।'

- না, এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললে বা দশটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সাথে একে মেলালে প্রকারান্তরে মেজরিটির রেইসিস্ট চরিত্রকেই ধারণ করা হয়। আর এর ফলে একটা অবভিয়াস জাতিগত নিপীড়নের ঘটনা আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

দেশের আর দশটা ঘটনার সাথে এই ঘটনাটা মেলানোর মতো লোকের অভাব নেই। একদল লোক একে না জেনে মেলায় আরেকদল লোক সব জেনেশুনে মেলায়। যেমন আদিবাসী নারী ধর্ষণের সাথে নোয়াখালী-চাঁদপুরের কোন কিশোরী ধর্ষণের মিল হয় না তেমনি মাটিরাঙ্গায় হামলার ঘটনার সাথে ঢাকা কলেজের ছাত্র আর দোকানদারের মারামারির ঘটনার মিল হয় না।

প্রতি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মিডিয়া খুব কৌশলে প্রচ্ছন্নভাবে মানুষকে ভুলিয়ে দেবার আর প্রশ্ন তৈরি না হবার মতো করে খবর ছাপায়। মিডিয়া মানুষের মনন-সংবেদনকে একটা ছাঁচে গড়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, বা মানুষের ভাবনার জগতটাকে আকৃতি (Shape) দেয়। মানুষ কি নিয়ে ভাববে আর কি নিয়ে আহাদ করবে সেটা মিডিয়া দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আশির দশক থেকে পার্বত্য চুক্তি পর্যন্ত পাহাড়ের সব খবর ক্যান্টনমেন্ট ঘুরে যেতো। তারা নিজেদের মতো করে ফিল্টারিং করে, সেন্সর করে খবর ছাপাতো। সেই সেন্সরশিপ আর ফিল্টারিং এর কারণেই পাহাড়ে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটনার কোন রেকর্ড/ আর্কাইভ/ পত্রিকা/ম্যাগাজিনে পাওয়া যায় না। সেই সময় থেকে অন্তরালে মানুষ মারার সংস্কৃতি আর আজকের ভয়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সাথে বাংলাদেশের মিডিয়া সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বলতে পারেন, দেশে আসলে মানুষের ন্যূনতম আস্থার জায়গাটা আসলে কোথায়?

পরিচিতি ঃ অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী

নারী মুক্তি কোন পথে

-মন্টি বৈষ্ণব

নারীমুক্তি ব্যক্তি মানবমুক্তির সংগ্রাম বিজয়ী হতে পারে না। তেমনিভাবে মানবমুক্তি ব্যক্তি নারী সমাজের মুক্তি সাধন ও সম্ভব হতে পারে না। সে কারণে বলা যায় যে, সকল প্রকার বৈষম্য ও শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে মানবমুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে নারীমুক্তির ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারী মুক্তির সংগ্রাম তাই নারীর নয়। সকল শোষিত মানুষের। গণতন্ত্র, প্রগতিও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে অগ্রসর করার জন্য নারী মুক্তির সংগ্রামকে বেগবান করতে হবে। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে সেলাইকলের হাজার হাজার নারীশ্রমিক ন্যায্য মজুরি, দশ ঘন্টা কাজ, উন্নত কর্ম পরিবেশ ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনরত বহু নারীশ্রমিক পুলিশের নির্মম অত্যাচারের শিকার হন এবং গ্রেফতারবরণ করেন। ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরের কারখানার নারী শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষে নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমর্থ হন। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ আবার নিউইয়র্ক শহরের পূর্বপ্রান্তে হাজার হাজার নারী দর্জি শ্রমিক তাদের ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন দাবিতে বিশাল এক প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দেন। ইতিহাসে যা 'বিশ হাজারির উত্থান' (আপরাইজিং অব টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড) নামে খ্যাত। নারী শ্রমিকদের এ সংগ্রামকে স্মারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন বিপ্লবী ক্লারা জেটকিন। তাঁর প্রস্তাবনা ও উদ্যোগেই ৮ মার্চ 'আর্ন্তজাতিক নারী দিবস' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ব্যাখ্যা করা হয় যে, কী কারণে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সর্বহারা শ্রেণিই নারী জাতির প্রকৃত মুক্তির জন্য একনিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম। ১৮৬৮ সালে শ্রমিক শ্রেণির প্রথম আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে কাল মার্কস নারীর অধিকারের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন। তার প্রচেষ্টায় প্রথম আর্ন্তজাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে পুরুষের সঙ্গে নারী শ্রমিকদেরও সভ্যপদ দেয়া হতে থাকে। ১৮৭১ সালে প্যারী বিপ্লবে নারীদের ভূমিকা ঐতিহাসিক এবং অবিস্মরণীয়। কাল মার্কস লিখেছেন- 'প্যারীর রমণীগণ মহৎ একনিষ্ঠ রূপে বিপ্লবের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছেন। প্যারীর নারীরা ব্যারিকেড ও বধ্যভূমিতে প্রফুল্ল মনে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।' ১৯৮৯ সালে প্যারী শহরে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক শ্রমিক সম্মেলনে কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিল সর্বপ্রথম সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি উত্থাপন করেন। এরপর থেকেই ইংল্যান্ড, জার্মানি ফ্রান্স সর্বত্রই

নারী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।

মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা, বুদ্ধিমত্তা, সাংগঠনিক দক্ষতা থেকে ক্লারা জেটকিন ১৮৭৪ সালের দিকে জার্মানির নারী আন্দোলন ও শ্রম আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে জার্মানির কমিউনিস্ট নেত্রী কমরেড ক্লারা জেটকিন বছরের যেকোন একটি দিনকে নারীদের ভোটাদিকার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করেন। ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ দিনটি সর্বপ্রথম আর্ন্তজাতিক নারী দিবস রূপে পালিত হয় এবং তারপর থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী নারীরা মার্চ মাসের বিভিন্ন দিনে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন শুরু করেন। অবশেষে ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের নারী দর্জি শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ভোটাধিকার আন্দোলনকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। পরবর্তীতে শুধুমাত্র শ্রমজীবী নারীদের সমঅধিকারের দাবিই নয়, নারীমুক্তির প্রতীক দিবস হিসেবেও এ দিনটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর থেকে প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিলে, কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা ছাড়াও সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন মতের মানুষ এ দিবসটি পালন করা শুরু করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের রয়েছে ঐতিহাসিক তাৎপর্য। মানুষ হিসেবে একজন নারী তার পরিপূর্ণ অধিকারের দাবিতে সুদীর্ঘকাল আন্দোলন চালিয়ে আসছে। অথচ নারীরাই সব দেশে সবার চেয়ে পিছিয়ে আছে। পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাত প্রায় সমান। সমাজ একসময় মাতৃতান্ত্রিক ছিল। সে সময় নারীরা সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতো। ফ্রেডরিক এঙ্গেলেসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' এবং হেনরি লুই মর্গানের 'আদিম সমাজ'সহ আরো বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে আলোচনা দেখা যায়। মর্গানের মতে, নারী-পুরুষ দ্বন্দের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে পরিবার বিকশিত হয়েছে। আদিম যুগে দেখা যায়, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিধি নিষেধ ছিল না। এ কারণে, সন্তানের পিতৃ পরিচয়ও ছিল না। সে সময় কৃষিকাজ নিয়ন্ত্রণ করতো নারীরা। সন্তান জন্ম ও লালনের জন্য পুরুষের সাথে নারী শিকারে যাওয়া থেকে বিরত থাকতো। কৃষিকাজ মানব ইতিহাসে নারীর হাত ধরে বিকশিত হয়েছে। মার্কস এবং এঙ্গেলেস বলছেন, মানুষের ইতিহাসে নারী এবং পুরুষের কাজের পরিধিকে কেন্দ্র করে প্রথম শ্রম, বিভাজনের সূত্রপাত হয়। প্রথম শ্রেণি নিপীড়নের সূচনাও নারী এবং পুরুষের মধ্যে ঘটে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডের ভার পুরুষের হস্তগত

হওয়ার মাধ্যমে নারীর পরাজয় সূচিত হয়।

মার্কসীয় নারীবাদের আন্দোলন-পুরুষদের বিরুদ্ধে নয়। এ ধারার আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচি হচ্ছে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা। মার্কসবাদীদের মতে, কেবলমাত্র এ প্রক্রিয়ায়ই নারীর পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন সম্ভব। কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ক্লারা জেটকিন, ভ্লাদিমির লেনিন, আলেকজান্ডার কোলনতাই প্রমুখ মার্কসবাদীরা নারীবাদকে শক্তিশালী অবয়ব দেন।

তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেরূপ পরিপূর্ণ নারীমুক্তি কোন পথে সম্ভব? স্রোতের বিপরীতে যেতে হলেও এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়ার জন্য ভাবতে হবে। ভাবতে হবে মুক্ত মনে। মার্কসীয় তত্ত্ব প্রকাশের পূর্বকাল থেকেই নারীদের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা হতো যে, নারীরা চিরকাল পরাধীন ছিল এবং থাকবে। নারী জাতির পরাধীনতা ও সামাজিক বৈষম্যের মূল অর্থনৈতিক উৎসটির কথা উনবিংশ শতাব্দিতে সর্বপ্রথম মার্কস-এঙ্গেলসই তুলে ধরেন। মার্কসবাদী তত্ত্ব দেখিয়ে দিয়েছে যে, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা বা শ্রেণি শোষণের সূচনা থেকেই নারীর পরধীনতা ও দাসত্ব শুরু হয়েছে। নারীর পরাধীনতার মূলে আছে নারীকে সামাজিক উৎপাদনের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরকন্যার কাজে আটকে রাখা এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলা। তাই নারীর সামাজিক মুক্তির প্রথম উপায় হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে নারীদের যুক্ত করা। নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা ও সেজন্য সমাজ ব্যবস্থার আমূল বিপ্লবী পরিবর্তন ব্যতিত এ কাজ পরিপূর্ণ রূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

নারীমুক্তি কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন সামাজিক, অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীরা অংশগ্রহণ করবে। কেবলমাত্র তেমন অবস্থাতেই নারীরা সমাজে পুরুষের সমান স্থান পাবে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সৃষ্টিশীল সত্তা বিকাশের প্রশ্নে নারীকে দ্বৈত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে নামতে হয়। শ্রমিক হিসেবে তার লড়াই পুঁজির বিরুদ্ধে এবং নারী হিসেবে লড়াই পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। তবে পুরুষতান্ত্রিকতা ও পুঁজির শ্রমদাসত্ব থেকে নারীমুক্তির এই লড়াই শুধুমাত্র কারখানাভিত্তিক কিছু অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায় কিংবা পুরুষতান্ত্রিকতা বিরোধী কিছু নারীবাদী শ্লোগানের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। বরং মানুষ হিসেবে নারীমুক্তির এই লড়াইয়ের আঘাত পরিচালনা করতে হবে গোটা পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাই একদিকে পুঁজির শোষণ অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণের দাসত্ব থেকে গোটা সমাজকে মুক্ত করতে না পারলে নারীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। এ সংগ্রাম আসলে 'মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ' নির্মাণ, তথা সাম্যবাদী সভ্যতা নির্মাণের জন্য সংগ্রামের সাথে সমার্থক।

নারী দিবসের তাৎপর্যকে আড়াল করার জন্য আমাদের দেশসহ দুনিয়ার দেশে দেশে শোষক শ্রেণি এনজিও, কর্পোরেট পুঁজির নানা উৎসব আয়োজন ইত্যাদি নানা অপ্রয়াসের আশ্রয় নেয়। আমাদের দেশে ও বিশ্বের অনেক দেশে এনজিও ও বহুজাতিক কোম্পানি বা বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর নারী উন্নয়ন বা জেন্ডার ডেভলপমেন্ট নিয়ে যেসব ভাওতাবাজি মার্কা কাজ চলছে তা তারা করছে নারীকে মূলত পরাধীন করে শোষণের বেড়াজালের ভেতর আটক রাখার গোপন কৌশল হিসেবেই। এনজিও'র মাধ্যমে পরিচালিত প্রজেক্টভিত্তিক নারী উন্নয়নমূলক সংস্কারধর্মী কাজের দ্বারা প্রকৃত নারীমুক্তি সম্ভব নয়। রাজনৈতিক লক্ষ্যবিহীন এসব কর্মসূচি পালনে তেমন কোনো লক্ষ্য সাধিত হয় না।

নারীর প্রতি সকল প্রকার শোষণ-বৈষম্য-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি লড়াই করছে। এই লড়াই যেমন নারীর প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র অভিমুখী, তেমনি বিদ্যমান ব্যবস্থায় নারীর সর্বোচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত। নারীমুক্তি হবে তখনই-যখন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। নারীমুক্তির ঝাণ্ডা ও কাস্তে-হাতুরিখচিত সমাজতন্ত্রের লাল-ঝাণ্ডা- এই উভয় ঝাণ্ডাকে একসাথে উড্ডীন রেখে এগিয়ে যেতে হবে মুক্তির পথে।

পরিচিতি ঃ সাবেক ছাত্রী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বপ্ন এবং স্বপ্নগুলো

- রাই চরণ

দেখতে দেখতে প্রবাসে আজ অনেক বছর হয়ে গেলো। কিন্তু তাই বলে নাড়ির টান, শিকড়ের টান ছিন্ন হয়নি। আর সে কারণে প্রতিনিয়ত অনেকের কাছ থেকে অনেক অনেক মেইল পাওয়া সত্ত্বেও, প্রত্যেক বছরই অরূপ বুবুরে মতো অধীর আগ্রহে থাকে বাংলাদেশ থেকে একটা চিঠির জন্যে। আর সে চিঠিটা পেলেই তার ব্যস্ততা শত গুণ বেড়ে যায়। গতকাল বহুল আকাঙ্খিত চিঠিটা পেয়েছে সে। যার কারণে আজ তার একটুও অবসরের ফুসরৎ মিলছে না। গতকাল চিঠি পাওয়ায় আজ সারাদিন ডিপার্টমেন্ট, ক্লাস, গবেষণাগার ছুটির জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করতে করতে এক ব্যস্তময় দিন চলে গেলো তার। এখন ডিপার্টমেন্টে নিজের রুমে বসে, গবেষণার নেতা হিসাবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো নিরীক্ষণ করছে। এমন সময় হুত করে আবার তাকে টাইম মেশিনে অতীতের অনেক পিছনে নিয়ে গেলো...

অরূপ ভাবছে- আজকের অরূপ কি অরূপ হতে পারতো, হতে পারতো যুক্তরাষ্ট্রের MIT-র গণিত আর তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক? বের হতো আন্তর্জাতিক জার্নালে তার কয়েকটা গবেষণা-পত্র? পারতো না। তাদের সংস্পর্শ ছাড়া সে এখানে আসতে পারতো না। তার প্রতিভার কিছুই হতো না। নষ্ট হয়ে যেতো। কীভাবে পারতো, যেখানে জীবন নিয়ে টানাটানি সবসময়। যেখানে দু'মুঠো খাবারের জন্য চিন্তায় থাকতে হয় সবসময়, যেখানে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের চাইতে সেটেলারদের আক্রমণের ভয়ে থাকতে হয়, সেখানে তো পড়ালেখা দূর অস্ত। কিন্তু, এতোসবের সে স্বপ্নকে ছাড়িয়ে অনেক দূর গেছে, যেখানে অনেকেই অনেক সুযোগ আর সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও কিছুই হতে পারেনি।

তার খুব মনে পড়ে, যখন সে ছোট্টটি ছিল- স্কুলে যেতো আর আসত। তাও নিয়মিত না, অনিয়মিতভাবে। দেখার কেউ ছিলো না। ভাষাগত সমস্যা থাকায় লেখাপড়ার প্রতি তার তেমন আগ্রহ জন্মে নেয়নি কখনো। আগ্রহ জন্মাবে কীভাবে, যেখানে শুরুতে নিজ মাতৃভাষা ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষায় লেখাপড়া শিখা। মা-বাবারাও লেখাপড়ার প্রতি তেমন সচেতন না থাকায়, এবং নিজেরা অক্ষর জ্ঞানহীন থাকায় ছেলেকে কখনো লেখাপড়া বিষয়ে তেমন কিছু বলতো না। মা-বাবাদের জুমে সাহায্য করে, বন্ধুদের সাথে এদিক-সেদিক ঘুরে, আর মাঝে মাঝে স্কুলে গিয়ে আর সেটেলার আক্রমণের ভয়ে জীবন বেশ যাচ্ছিলো। হঠাৎ এই জীবনের কিছুটা ছন্দ-পতন ঘটে। একদিন সে সহ তার সমবয়সীরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, কিছু চমৎকার তরুণ-তরুণী তাদের এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের আর পাড়ার অধিবাসীদের সাথে কথা বলা শুরু করলো। আর তাদের ডেকে ডেকে চকলেট দিলো যা জীবনের প্রথমবারের মতো খাওয়া তাদের। এবং কিছুদিন পর লক্ষ্য করল যে, সেই তরুণ-তরুণীরাই বিকালবেলায় শিক্ষকদের মতো স্কুলের কয়েকটা রুমে পড়াতো তাদের! সেভাবেই শুরু..

তরুণ-তরুণীরা একমাসের মতো ছিল, তখন। কিন্তু সেই একমাসে সে বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, পাড়ায় কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু পরিবর্তনটা কী সে ঠিক ধরতে পারেনি। তবে সে এটা লক্ষ্য করেছে যে, আগে রাতের বেলায়, মাতালদের হুই-হুল্লোড় শোনা যেতো, এখন আর তা যায় না। তার মনে হলো নিজেও অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে! আগে লেখাপড়ার প্রতি তার কোন আগ্রহই ছিল না, আর এখন সে লক্ষ্য করেছে একদিন বই না ধরলে তার কিছুই ভালো লাগে না। একটুও না, শুধু তার না, সবারই একই রকম, তার মতো! তরুণ-তরুণীরা কবিরাজদের মতো কি যাদু করলো কে জানে! তা না হলে তাদের পড়ালেখার প্রতি এতো আগ্রহ জন্মাবে কেনো? যাদুই করেছিলো তারা। তরুণ-তরুণীরা তাদের পড়াতো না, শুধু গল্প করতো। বিভিন্ন গল্প। যেগুলো বইয়ে নেই। কিন্তু এই গল্প করতে করতে কবে যে, বইয়ের পড়ার সাথে অনেকগুলো বিষয়ও জেনে যেতো তারা তা লক্ষ্যই করতো না। পরে যখন জানতে পারে, তাদের আনন্দ আর বিস্ময়ে সীমা থাকতো না। লেখাপড়া কি এতোই আনন্দের, তারা তা জেনে অবাক হতো।

তরুণ-তরুণীরা অরূপদের গ্রামে বছরে দুইবার যেতো, প্রতিবারে এক মাসের মতো থাকতো। তবে প্রত্যেকবার যে, একই তরুণ-তরুণীরা যেতো, সেটা না, ভিন্ন ভিন্ন তরুণ-তরুণী যেতো। মজার ব্যাপার ছিল, তারাও নাকি তাদের মতো শিক্ষার্থী। তবে তারা অনেক বড় স্কুলের। তাদের এই কার্যক্রম নাকি নিজেদেরই অর্থায়নে চালায়। কেউ পড়ালেখার পাশাপাশি টিউশন করে টাকা জমিয়ে, কেউ পার্ট-টাইম জব করে টাকা জমিয়ে এই সংঘটন চালায়। তারা শুধু অরূপদের গ্রামে নয়, অনেক গ্রামে নিজেরা ভাগ-ভাগ হয়ে তাদের ছুটিতে এই কার্যক্রম চালায়। তারা কতো বড়, তবুও তারা অরূপদের সাথে বন্ধুর মতো মিশতো। এমন কিছু ছিলো না, যা তারা জানতো না, তারা সব জানতো মনে হতো। কেননা অরূপরা যায় জানতে চাইতো, তাই তারা হুত করে বলে দিতে পারতো। এদের সংস্পর্শে এসেই অরূপরা বুঝতে পারলো পৃথিবী অনেক বড়। তারা কিন্তু নিজ ভাষায় কথা বলতো, যার কারণে অরূপদের ভাষাগত সমস্যায় কখনো পড়তে হয়নি, আর এটা তাদেরও খুব সহজে আপন করে নিতে সাহায্য করলো। তাদের মাধ্যমেই অরূপ জানতে পারলো, লেখাপড়ার কোনো শেষ নেই। জেনেছে, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার কথা, বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনার সুযোগসহ আরও কতো কী। সে-ই সাথে জানতে পারলো আদিবাসীদের নিজ নিজ সংস্কৃতিকে চর্চার কথা আর ঐতিহ্যকে ভালোবাসার আর সেগুলো রক্ষার্থে অধিকতর সচেতন হওয়ার কথা। তারা প্রায় বলতো, "যায় কিছু হও না কেনো, নিজের শিকড়কে ভুলো না, ভুলো না নিজেদের ঐতিহ্য আর ইতিহাসকে, কারণ এই শিকড় থেকে যা পেয়েছো তা সারা জীবনের অমূল্য সম্পদ"।

সময় গড়িয়ে যায়, ছড়ার পানি নদী হয়ে সাগরে, ঐখান থেকে মহাসাগরে। অরূপও আর ছোট থাকেনি, ছোট ক্লাসে পড়ে থাকেনি, সেও সময়ের বহমানের মতো অনেক উপরে ক্লাসে উঠে। দেখতে দেখতে এস.এস.সি পরীক্ষাও দেয়। ফলাফল হয় ঈর্ষনীয়। কিন্তু সেই ঈর্ষনীয় ফল নিয়েও দারিদ্রতার কারণে অরূপের লেখাপড়া সেখানে থমকে যেতো, কিন্তু যায় নি। তার কারণ সমাজের কিছু বড়লোক তার পড়ালেখার খরচ জোগাতে এগিয়ে এসেছিলো। পরে এইচ.এস.সি পাশের পর, ঐ বড় ভাইবোন তরুণ-তরুণীদের সংঘটনের সহায়তায় আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির জন্য আবেদন। সাথে এই দেশেও চলে আবেদন। তার স্বপ্নকে হার বানিয়ে আমেরিকার কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য অফার। সে MITটির অফার গ্রহণ করে। তারপর পড়ার জন্য, দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে চলে যায় আমেরিকায়। ভালো ফলাফল করায় কোর্স শেষ করার পর MITটির কর্তৃপক্ষ সেখানে লেকচারার হিসাবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু সে সাথে সাথে প্রস্তাব লুফে নেয়নি, সে চেয়েছিলো দেশে শিক্ষক হতে। কিন্তু দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শিক্ষক হিসাবে যোগ্য মনে করেনি। যার ফলে সে MITটির প্রস্তাব লুফে নিয়ে সেখানে লেকচারার হিসাবে যোগদান করে।

অনেক বছর আমেরিকায় থেকেও তার শিকড়কে ভুলেনি সে, যার কারণে তার ছেলেমেয়েরা আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেও নিজেদের মাতৃভাষা ভালোভাবে রপ্ত করেছে। ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন থেকেছে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের স্কুলে বিভিন্ন ফাংশনে নিজেদের ঐতিহ্য তোলে ধরে নিজেদের পরিচয়কে সুমুন্নত করে। আর ভুলেনি বিধায় তো শত ব্যস্ততার পরও সারাবছর বুবুরে মতো অপেক্ষায় থাকে, শুধু একটা চিঠির জন্যে। আর চিঠি পেলেই শুরু হয় দেশে যাওয়ার ব্যস্ততা। কেননা এই সময়টাতে নিজ দেশের আদিবাসীদের নিয়ে সংঘটিত হয় সম্মেলন। দেশে-বিদেশে বাস করা জাতির সবাই মিলিত হয় এই সম্মেলনে- কিছু স্বপ্ন, কিছু আশা নিয়ে। আর অরূপ নিজেই কিছু ছেলেমেয়েকে পড়াশোনার খরচ যোগায়, সে চায় সব শিশু পাক শিক্ষার সমান সুযোগ। অরূপের স্ত্রীর ফোন। ভাবনার সময় থমকে দাঁড়ায়। তাকে এখন বাড়ি ফিরতে হবে।

লেখকের নোট : গল্পটি কাল্পনিক, কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কখনো কখনো বাস্তব গল্প বা রূপকথাকেও হার মানায়। আর মানুষ তো তার স্বপ্নের সমান বড়। আমরা কি ছোট ছোট চেষ্টা আর ইচ্ছার মাধ্যমে যে যার অবস্থান থেকে আমাদের সমাজকে পরিবর্তন করতে পারি না? পারি না সুন্দর একটা সমাজ উপহার দিতে? মতা, পদ, টাকা নিয়ে আমাদের এতো মোহ কিসের? পরিবর্তনের ইচ্ছে থাকলে, ছোট্ট একটা কাজ দিয়ে পরিবর্তনের সূচনা করে দিতে পারি, আমাদের সে ইচ্ছে আছে তো? প্রশ্ন রইলো।

পরিচিতি : সাবেক ছাত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

"অধিকারে যখন রাজনীতি প্রবেশ করে"

-মিলিন্দ তনচংগ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বহুজাতি ও বহু সংস্কৃতির লোকের বাস। যাঁদের রয়েছে চোখ ধাঁধানো ঐতিহ্য এবং ভাষার সংস্কৃতি। পিছনে আছে এক বিশাল ইতিহাস। প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠী নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস নিয়ে গর্ব করে এবং ধারণ করে। তবে আমি আদিবাসী ইতিহাসবেত্তা নয়। আমি পর্যালোচনা করছি আমার নিজস্ব গণ্ডি থেকে। আমরা সবাই যে যার মতো অর্থাৎ আমি শুধু নিজের জাতের কথায় ভাবি বা ভাবতে ভালোবাসি অন্য জাতিসত্তার না। কিন্তু তাতেই কি হয়? যদি বলি জাতি প্রেমিক তবে সাম্প্রদায়িক, যদি বলি সে নিজ গণ্ডির মধ্যে ব্যস্ত বোধহয় ভূল হবেনা। তাহলে হলো কি! যে যার মতো, আর গড়ে উঠলো না কোনো সর্ব গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব। এখানে আবার অনেক সময় Dominant বিষয়টি কাজ করে বা মানসিকতা থাকে। এক পক্ষ মনে করে অন্যপক্ষ মনে হয় বেশি পাচ্ছে আর আমরা কম পাচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বাভাবিক সন্দেহের কাজ করে। তবে সত্য সন্দেহ লাগারও কথা ঐ যে বলেছি যিনি পাচ্ছে তিনি তার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পাশের জনের জন্য দরদ নেই। অথচ সেও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠী।

যেমন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা মারাত্মক বিষয়, বাঙালি জাত বা পশ্চিমা জাত করছে আদিবাসী সমাজের ওপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আর অপরদিকে পাহাড়ে বড় জাতরা করছে ছোট জাতদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এই যে রাঙামাটি শহরে যতবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় কোন বড় জনগোষ্ঠী অন্য সকল জাতের পোশাক পড়ে প্রতিনিধিত্ব করছে। আর সেসব কুকাম করছে তথাকথিত কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন আর সরকারি বেসরকারির মাথাওয়ালা কিছু ফিগার। এসব দেখে খুব খারাপ লাগে, তাদের অনেকের যুক্তি "সময় কম পাই বা শিল্পী খুঁজে পাওয়া যায়না" কিংবা "বাজেট নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো হলো বাজে যুক্তি। ভালো ও আন্তরিকভাবে খুঁজলে অবশ্যই পাওয়া যাবে কারণ এখন স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। সুতরাং পাওয়া যায় না বা নেই বলে কোন কথা নেই, আপনাকে খুঁজতে হবে। আর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তো টাকার কাছে নিজের বিবেক ও চেতনাকে বিক্রি করে ফেলেছে। ১১ জাতিগোষ্ঠীরর নাম জমা দিয়ে বিল পাস করাবে আর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করায় মাত্র এক বা দুই জনগোষ্ঠীর শিল্পী দিয়ে। আর বাকিরা বঞ্চিত। অনেক সময় দেখা যায় অন্যের সংস্কৃতির নাচ বা গান ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়।

এই যে দেখেন সংখ্যাগরিষ্ঠ পাবলিক যখন আমাদের ওপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন করে তখন চিল্লানী দিই কিন্তু আমিও যে আরো সংখ্যালঘু পাবলিককে সংখ্যাগুরুদের মতো আচরণ করি তখন বিবেক লুকিয়ে থাকে। সেদিন একজন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে এরূপ ব্যক্তির সাথে আলাপ কালে সে ব্যক্তি বলে এটা নাকি এখানে সিস্টেম হয়ে গেছে। মানে তিনি নিয়ম বসে যাওয়াকে বুঝাতে চেয়েছেন। তার মানে তিনি যে একদা অধিকারের রাজনীতি করেছেন আজ সিস্টেমের কাছে তিনি হার মেনেছেন। তারমানে তার রাজনীতি ছিল পিট বা পেট বাঁচানোর রাজনীতি। যে রাজনীতিকে আমি ঘৃণা করি। এরকম কাজের ফলে কি হয় জানেন? পরস্পরের প্রতি বেড়ে যায় অবিশ্বাস জন্ম দেয় চাপা ক্ষোভ।

তন্মধ্যে Dominant বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে কাজ করে যেমন জাতিগত প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তি ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতা বা স্বার্থের প্রতিযোগিতা। সবকিছুতে স্বার্থ জড়িত কিন্তু সব স্বার্থ সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। এভাবে দিন দিন প্রান্তিকরা আরো প্রান্তিক হবে, আর কিছু জাতির সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটবে। তবে কি আমরা তা চাচ্ছি?

নিচের কলাম গুলো পড়লে অনুমান করা যাবে অধিকারের ভিতর কিরকম নোংরা রাজনীতি প্রবেশ করেছে।

১...

১৯৯৬ সাল ১২ই জুন কল্পনা চাকমার অপহরনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আদিবাসী শিশু বা নারীর ওপর অন্যায় অনাচার এবং অপহরণ ঘটনা। কল্পনা ছিলেন একজন প্রতিবাদী নারী কণ্ঠস্বর। তাকে অপহরণ করা হয় অস্ত্রের মূখে। তাকে অপহরণ করা হয়েছে মূলত তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার জন্য। তাকে অপহরণ করা হয় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সদস্য দ্বারা, তাদের মধ্যে একজন ছিল ১৭তম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে লেফটেনেন্ট ফেরদৌস। অন্যান্যদের মধ্যে থেকে নুরুল হক, উগলছড়ি থেকে মুন্সি মিয়ার পুত্র, যিনি একজন ভিডিপি কমান্ডার। (তথ্য- কল্পনা চাকমা, সালাম আজাদ/১২৮ পৃষ্ঠা) এরই বিভিন্ন অভিযোগেরপরিপ্রেক্ষিতে শুরুতে সামরিক কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে, কল্পনার অপহরণ কিছু প্রণয়ঘটিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ তাদের কথায় ইঙিত করা হয়েছিল যে, তিনি (কল্পনা) লেফটেনেন্ট ফেরদৌসের সাথে প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক আছে এবং তার কাছে চলে যায়। [কল্পনা চাকমা, সালাম আজাদ/১৩০ পৃষ্ঠা] অর্থাৎ বিচার চাওয়ার অধিকারকে প্রণয় ঘটিত বলে চাপিয়ে দিয়ে, ভিন্ন খাতে প্রবাহমান করা হয়। তখন অধিকার অধিকারের স্থানে থাকে না, প্রবেশ করে রাজনীতি।

২.....

১৯৯৬ সাল থেকে আজ অনেক বছর বিয়োগ হয়ে গেল। বিয়োগ হয়েছে অনেক

কল্পনা। তন্মধ্যে মনে আছে শুধু সবিতা চাকমা, তুমাচিং মারমা, ছবি মারমা প্রমুখ। সবাইকে মনে রাখা সম্ভব না, মাত্র কটাদিন হতগুলো গায়ে লেগে থাকে। পূর্বে উল্লেখ করেছি কল্পনা কে অপহরণ করা হয় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু এখানে বেশ দৃশ্যমান যে সবিতা, তুমাচিং ও ছবিরাতো কল্পনার মত প্রতিবাদী ছিলো না। তারাতো সাধারণ শিশু বা নারী। তারাতো কখনো রাস্তায় প্ল্যাকার্ড ধরে অধিকারের কথা বলেনি, তারাতো মাত্র গরু আনতে বা জুমের তরকারি বা লাকড়ি আনতে গেলো। তবেই কেন তাদের ধর্ষণ করে হত্যা করা হবে? তন্মধ্যে এই নেপথ্যে যারা জড়িত তারা কেন শাস্তি ভোগ করবেনা বা ভুক্তভোগী পরিবার কেন ন্যায্য বিচার পাবেনা? সেসব আসামীরা তো রাষ্ট্র বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত নেই। সবকিছু অজ্ঞাত।তবে আসামীরা রাজনৈতিক আশ্রয়ে গাঁয়ে দাপিয়ে বেড়াবে।

৩....

গত কদিন আগে রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া থেকে যে আদিবাসী শিশুকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করা হয় তা অনেকাংশ কল্পনার মতো একি কায়দায় ঘটনা ঘটানো হয়। কল্পনার ঘটনায় ছিল ফেরদৌস আর শিপার ঘটনায় হচ্ছে বুলু শিকদার। মাত্র অভিনেতা বদল কিন্তু দৃশ্য এক। তখনকার সময়ে কল্পনার পরিবার সেনা প্রশাসনের কাছে সহযোগীতার প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু তা পায়নি উল্টো বলা হয়েছে কল্পনার সাথে ফেরদৌস এর প্রণয় আছে। তদ্রুপ শিপার পরিবার ও গ্রামবাসী তাকে উদ্ধারের জন্য স্থানীয় ক্যাম্পে সাহায্য প্রার্থনা করে যেখানে শুধু বলা হয়েছে করছি, খুঁজছি আর আশ্বাসের ফুলঝুরি। আর স্থানীয় থানার এক উর্ধ্বতন ব্যক্তিতো বলেই বসেছে যে শিপার সাথে বুলু শিকদারের প্রেম আছে। আর বুলু নাকি সন্ত্রাসী। আপ্রাণ চেষ্টার ৪৮ ঘন্টার পর শিপার উদ্ধার হয়। এখানে পার্থক্য শুধু শিপা উদ্ধার হয়েছে আর কল্পনা উদ্ধার হয়নি অন্যদিকে ছবিরা লাশ হয়েছে। প্রেম থাকা অস্বাভাবিক নয় থাকতেই পারে। কিন্তু সত্যিকার যদি প্রেম থেকেই থাকে তবে কেন রাতে অস্ত্রের মুখে তুলে আনা? যেমনটা কল্পনাকে অপহরণ করা হয় সেদিন রাত একটা বা দেড়টা সময়ে। শিপাকে ভোর সাড়ে তিনটা।

সেক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলো কি ইঙ্গিত বহন করে? আমি যদি বলি শিপার (শিপা তঞ্চঙ্গ্যা) অপহরনের পিছনে অবশ্য ভূমি দখলের সম্পর্ক আছে, রয়েছে নোংরা রাজনীতি(??) বোধহয় ভুল হবে না। বিভিন্ন ভয়ভীতি মাধ্যমে তাদের উচ্ছেদ করায়তো মূল টার্গেট নাকি? কেননা শিপারা ছিল মাত্র দুই আদিবাসী পরিবারের বসতি আর চারপাশে বাঙালি। অতএব ঘটনার পিঠে ঘটনা বেশ জড়িত। এই যে প্রত্যেক ঘটনাগুলো কোথাও না কোথাও যোগসাজেশ পাওয়া যায়। এরকম যদি ঘটতে থাকে তাহলে বলতে হয় শিপার পর কে? আর সেক্ষেত্রে আমরা কি ভাবছি? এতেও কিন্তু অধিকারের পিঠে রাজনীতি ঢুকিয়ে অধিকারকে কলুষিত করা হয়েছে।

নিজের বা নারীর জন্য একটি কক্ষ চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। (নারী /হুমায়ুন আজাদ)
সমাজে নারীর প্রতিপক্ষ একমাত্র প্রাণী পুরুষ। নিজের বানানো অলিক বিধাতার পার্থিব প্রতিনিধি; পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়; তাকে বন্দী করার জন্য তৈরি করেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র; উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এনেছে প্রেরিত পুরুষ ; লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অসংখ্য দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য। সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা ও আরো অনেক শাস্ত্র। এই শাস্ত্র গুলো নারীকে বন্দি করার এক একটি অস্ত্র। এরকম অস্ত্র দিয়ে বোধহয় কোন দিন সম্মুখীন হয় কোনো রাষ্ট্রীয় বাহিনী। পুরুষ নারীর স্বাধীনতা চায়নি বলে এরকম ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র তাক করে রেখেছে নারীর দিকে। পুরুষ এমন এক সভ্যতা গড়ে তুলেছে, যা নারীকে সম্পূর্ণ বন্দি করতে না পারলে সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার ভয় রয়েছে পুরুষের। এ সভ্যতার নাম পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ হলো শোষক শ্রেণী আর নারী হলো শোষিত শ্রেণী। এ সভ্যতার সকল শাখায় রয়েছে পুরুষের অবাধ বিচরণ।
পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার বয়স কয়েক সহস্রক; কিন্তু পৃথিবী ও মানবপ্রজাতি, যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে বা ঘটায় তবে টিকে থাকবে আরো কয়েক কোটি বছর।
পৃথিবীতে কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, ক্রমশ নারী হয়ে উঠে আর পুরুষ তাদের নারী বানাতে উত্তম ভূমিকা পালন করে।
পুরুষের এক মহৎ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী! / পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি"। রোম্যানটিকের চোখে নারীমাত্রই দয়িতা বা মানব সুন্দরী।, তাই তাঁর চোখে পড়েছে নারীর চারপাশের বর্ণ, গন্ধ, ভূষণ যাতে নারীকে করে তুলে আরো সুন্দর মহিমা।
নারীকে দাবি করা হয় পুরুষের ভাগ, অর্থাৎ পুরুষের কোন অঙ্গ দিয়ে নারীর শরীর গঠিত, অতঃপর পুরুষ নির্দ্বিধায় বলে নারী অর্ধাঙ্গ। নারীকে বানানো হয়েছে পুরুষের কামসঙ্গী। কিংবা বসানো হয়েছে পরিচারিকার পদে।
নিত্যকার আলোচনার টেবিলে পুরুষ মনে করে মানুষ মানে পুরুষ অন্য কেউ নয়।
বিধাতার সৃষ্টিকারী সবকিছু শক্তিধরও পুরুষ নিজেকে শক্তিশালী মনে করে, তারা মনে করে নারী দুর্বল। তাই নারীর ভাগ্যে জুটে অপয়া, অকর্মা, অর্ধাঙ্গিনী ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণ শব্দ।
এবার আসি নারী কাকে বলে তার ব্যাখ্যায়; দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯,৩৫) বলেছেন, পুরুষ বলে "নারী হচ্ছে জরায়ু, ডিম্বকোষ; নারী হচ্ছে স্ত্রীলোক।" (নারী /হুমায়ুন আজাদ) পুরুষ নারীর এমন সংজ্ঞা দেয় যা সবকটি নিন্দাসূচক।
সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সামান্যাদের সোহাগ খরিদ করে/ চিরন্তনীর অভাব মেটাতে হবে" তবেই সে হবে নারী। নারী মাত্র পুরুষের কাছে সামান্যা ঃ জরায়ু-যোনি-স্তনের সমষ্টি, নিজের লিঙ্গে ও যৌনতায় বন্দি পশু।

নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত প্রাণীঃ কথাটি ভার্জিনিয়া উলফের, যিনি পুরুষ নিজেকে এবং নিজের দেহকে বিশুদ্ধ ভাবে কিন্তু নারী কে ভাবে তার বিপরীত। পুরুষ নিজেকে ভাবে উত্তম, আদর্শ কাঠামো আর নারী দেহকে গণ্য করে বিকৃত, এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা কারাগার। রবি ঠাকুর যাকে বলেছেন "কুসুমের কারাগার"। আর এরিস্টটল বলেছেন, "নারী কিছু গুণের অভাববশতই নারী ; আমি মনে করি নারীস্বভাব স্বাভাবিকভাবেই বিকারগ্রস্থ- "। সন্ত টমাসের মতে, নারী হলো "বিকৃত পুরুষ" "এক আকস্মিক সত্তা"। [দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯,১৫)], আর ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম কিংবা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ নারীকে পুরুষের অতিরিক্ত "অস্থির পুনর্বিন্যাস" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (নারী /হু.আ.) অপরদিকে ফ্রয়েডের মতে, নারী হচ্ছে এমন এক মানুষ যার কোন এক একটি প্রত্যঙ্গ হারিয়ে গেছে। একে তিনি বলেছেন "খোজাগূঢ়ৈষা"। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে কোন অঙ্গটি হারিয়েছে নারী? তাঁর উত্তর ছিল "শিশ্ন"। যার স্বভাবকে তিনি "শিশ্নাসূয়া" বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যা দেন।

যে পুরুষতন্ত্র নারীকে সৃষ্টি করেছে, নির্দেশ ও প্রতিবন্ধী রূপে, তাকে সে কোন মূল্য দিবেনা তা স্বাভাবিক। তাকে বিবেচনা করবে না স্বায়ত্তশাসিত মানুষ হিসেবে তা অবধারিত। তাই পুরুষ হয়েছে ধ্রুব আর নারী হয়েছে আপেকি। পুরুষ নারীকে মনে করে যৌনসামগ্রী।

তার প্রেক্ষিতে তারতুলিয়ান নামক এক ব্যক্তি লিখেছেন নারী "তুমি শয়তানের দ্বার, তুমি বিপথগামী " (নারী /আজাদ)।

নারী পুরুষদের কাছে পরিচয় পেয়েছে দাসী হিসেবে, পরিচারিকা হিসেবে, অকর্মা বা অবলা হিসেবে। কখনো মানুষ হিসেবে পরিচয় পায়নি। যেমন শূদ্রদের রাখা হয়েছে শূদ্র হিসেবে, তাদের বাধ্য করা হয়েছে নিম্নবৃত্তে থাকতে। নারীকে দূরে রাখা হয়েছে অশিক্ষিত করে, তাদের অযোগ্য আখ্যা দিয়ে রাখা হয়েছে শাসনভার থেকে, দূরে রাখা হয়েছে রাজনীতি থেকে।

নারীর কোনো সহজাত অযোগ্যতা নেই, তার সমস্ত অযোগ্যতাই পরিস্থিতিগত, যা পুরুষের সুপরিকল্পিত সিস্টেম ও শাস্ত্রের দোহায় দিয়ে অস্ত্রের ব্যবহার। যাকে রাজনৈতিক হাতিয়ারের মতো ব্যবহার হচ্ছে শাস্ত্রের নামে ধর্মগ্রন্থ গুলো। যে গ্রন্থ সৃষ্টিকারী স্বয়ং পুরুষ।

আর সেই পুরুষ নারীর অধিকারকে হরণ করার জন্য ধর্মের ভিতরে রাজনীতি ঢুকিয়ে নারীকে করেছে বঞ্চিত। ঘৃণা করেছে নারীর অধিকারের চেতনাকে। বিভিন্ন অজুহাতে নারীকে করেছে ধর্ষণ। পাঠক, মনে আছে তো ২০১৬ সালের মার্চে স্বাধীনতা মাসের শেষ দিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে তনুর ধর্ষণের পর হত্যার কথা।

পরিচিতি ঃ ছাত্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষার বেহাল দশা

-অভিজিত বড়ুয়া

১৯৭১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নামক নব্য রাষ্ট্রের। এ নব্য রাষ্ট্রের আপামর জনগণ প্রত্যাশা করেছিল একটি শোষণ, বঞ্চনাহীন অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট হবে বাংলাদেশ। যে রাষ্ট্রে ধনী, গরিবের পার্থক্য থাকবে না। ধনী-গরিবের সন্তানরা একই স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ পাবে। কারণ, সমতার প্রথম পর্যায় হলো স্কুল-কলেজ। শিক্ষা হবে গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক একধারার। রাষ্ট্র শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবে। ধনীর সন্তান যেমন উচ্চ শিক্ষিত হবে তেমনি উচ্চ শিক্ষিত হবে ক্ষেতে খাওয়া হেমনতি মানুষের সন্তানরাও। তেমনি প্রত্যাশা ছিল সকল স্বাধীনতাকামী মানুষের।

কিন্তু, তেমনটি হয়-নি বা হচ্ছে না। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনুসৃত নয়-গণমূখী বিজ্ঞানভিত্তিক একধারার শিক্ষানীতি। ফলে চার ধারায় চলছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। একদিকে সাধারণ শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপক মাদ্রাসা শিক্ষা। অন্যদিকে চলছে নানান নামধারী ইংলিশ মিডিয়াম ও ক্যাডেট শিক্ষা ব্যবস্থা। কার্যত শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়ার কথা ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে হাতিয়ার, কিন্তু, তা হয়ে গেছে বৈষম্যের আকার। এর দ্বারা আমাদের মাঝে মতবিরোধ, মতানৈক্য দেখা দিচ্ছে প্রকট ভাবে। মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় ছিল জাতি হিসেবে আমরা বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়াবো। দাঁড়ানোর মেরুদন্ড হবে শিক্ষা। কিন্তু, দিন দিন শিক্ষাকে সংযুক্তি করা হচ্ছে। বৃটিশ বেনিয়াদের শিক্ষা দর্শন, পাকিস্তানিদের শিক্ষাদর্শন ও বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা দর্শন। অনেকাংশে এক। বিশ্ব ব্যাংক, আই.এম.এফ এর পরামর্শে চলছে শিক্ষা ব্যবস্থা। উচ্চ শিক্ষা ধ্বংসের ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র, হেফ্যাজ এর নামে উচ্চ শিক্ষা কমিশন আইন ২০১৪ এর নামে শিক্ষা সংকোচন ও বাণিজ্যিকরণের পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। ফলে নামে বেনামে ব্যাঙের ছাতার মতো গজে ওঠছে প্রাইভেট স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে সার্টিফিকেটের নামে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে বিশাল অংকের টাকা। বড় ধরণের উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে বাণিজ্যিক সান্ধ্যাকালীন কোর্স। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে পড়ছে গবেষণা খাতে। নেই কোন গণতান্ত্রিক চর্চা। ফলে- অকার্যকর করে রাখা হয়েছে ছাত্রসংসদ নির্বাচন। চলছে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের দখলদারিত্ব। রাষ্ট্রের যেন সে-দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কোচিং ব্যবসা। ফলে অভিভাবকরা সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় মিটাতে মিটাতে হিমশিম খাচ্ছে। আবার এসবক্ষেত্রে

বলি হওয়ার মতো অভিভাবকও রয়েছে অনেক। ইউনেস্কো শিক্ষা সনদে রাষ্ট্র স্বাক্ষর করলেও সনদ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে ২৫% বরাদ্দ রাখার কথা। কিন্তু, এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ মাত্র ১০.৭%। দিন দিন এ বাজেট কমছেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা খাতে পিছিয়ে পড়ছে পর্যাপ্ত বাজেটের অভাবে। যার প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতের বেহাল দশা।

পরিশেষে পাহাড়ির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কিছু হালচাল এখানে তুলে ধরছি, ভৌগোলিক ভাবে পাহাড়ের অবস্থান খুবই দুর্গম। পর্যাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার অভাব। দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা। আদিবাসী জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অভাব। মাঝখানে ঝড়ে পড়ার হার প্রকট। ফলে পিছিয়ে রয়েছে এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা। উচ্চ শিক্ষায় নিজেদের এগিয়ে নিতে পাহাড়ে প্রয়োজন পর্যাপ্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার। মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বর্গা দিয়ে শিক্ষক কাটানো বন্ধ করে মেধাবী ও যোগ্যদের এসব এলাকায় শিক্ষকতার ব্যবস্থা করে দেওয়া। যাতায়াত ব্যবস্থার সু-ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নির্বিঘ্ন করতে হবে। এসব ব্যবস্থা সঠিক ও সুচারুভাবে সম্পন্ন না করে শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে পাহাড়ের মানুষের এতটুকু লাভ হবে বলে মনে হয় না।

পরিচিতি ঃ ছাত্র, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

তঞ্চঙ্গ্যাদের উৎপত্তি ও কক্সবাজার জেলায় তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের এখনো গ্রাসী

- চৈতেঅং তঞ্চঙ্গ্যা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। এ দেশের আদিবাসী বৃহৎ অংশ বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। এছাড়াও রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী ও কক্সবাজারসহ বাংলাদেশে প্রায় জেলাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে। এসব অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় নিজস্ব পরিমণ্ডলে ও নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রেখে এ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে আসছে।

অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কক্সবাজারেও যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে আদিবাসীদের একটি সম্প্রদায় আর তঞ্চঙ্গ্যাদের বিরাট একটা অংশ। তবে দুই কিংবা তিন যুগ আগে রাখাইনদের বসবাস সম্পর্কে জানা থাকলেও এখানে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা ছিলনা বললেই চলে বিজ্ঞ মহলে। হয়ত অনেকে জানতেন এখানে বসবাসরত রাখাইনদের পাশাপাশি আরেকটা আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে। কিন্তু নাম আর নামের টাইটেলের জন্য অনেকে সংশয়ের মধ্যে পড়ে যান। আসলে এরা কোন সম্প্রদায়ে লোক? এদের উৎপত্তি বা কোত্থেকে? এদের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দিলে হয়ত বুঝার বাকি থাকবে না এরাই তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী।

আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে মায়ানমার থেকে রাখাইন সম্প্রদায় বাংলাদেশে চলে আসলে। তারা বর্মীদের হাতে আক্রমণে শিকার হন। এতে অনেক লোক প্রাণে মারা যান। বাকিরা বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। কিন্তু রাখাইনরা মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হত আর প্রায়ই যুদ্ধে জয়ী হত। তেমনি "দৈংনাক" নামে এক সম্প্রদায়ের সাথে আরাকান রাজা (রাখাইনদের রাজা) যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। আর নির্মমভাবে অনেক "দৈংনাক" সম্প্রদায়ের মানুষকে মেরে ফেলেন এবং যুদ্ধেও জয়ী হন। এতে হাজার হাজার "দৈংনাক" সম্প্রদায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নস্থানে পালিয়ে যান।

এভাবে অনেকে ভারত, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন। আর কিছু অংশ আরাকান রাজ্যে অবস্থান নেন। তবে এটি আরাকান রাজ্য থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল। তবে অনেকে মনে করেন পূর্বেও ভারতে তঞ্চঙ্গ্যা বসবাস করতেন। তাহলে স্পষ্ট করে বলতে পারি, তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় রাখাইনদের আগমনের

দু'শ কিংবা তিন'শ বছর আগে বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। অর্থাৎ ১৫'শ কিংবা ১৬'শ খ্রিষ্টাব্দে তঞ্চঙ্গ্যাদের আগমনের কোনো একটা দিন ছিল। দৈংনাক" সম্প্রদায় থেকে 'তঞ্চঙ্গ্যা" সম্প্রদায় কেমনে আসল, তা সবার কৌতুহল জাগার কথা। (একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বার্মা থেকে এসেছিলেন তিনিও একজন দৈংনাক অর্থাৎ তঞ্চঙ্গ্যা। উনার থেকে কিছু ধারণা আমার ডায়রিতে তুলে রেখেছিলাম। তিনি বার্মায় ভায়মা সিরিয়ায় ফাস্ট ইন বার্মা অর্থাৎ বাংলাদেশের বিসিএস- এর সমতুল্য ডিগ্রিধারী। উনার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে আমার সামান্য ধারণা তুলে ধরলাম।

ভারতে শহরগুলোতে (কলিয়া, কপিলাওয়াইত, দেওয়াধাহা) বলা হত "চাইক্য"।

মায়ানমারের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন নামে ডাকা হত।

- মেছাগিরি শহরে ডাকা হত "ম্যাছাগিরি"
- চাইমাননগু শহরে ডাকা হত "দাগং"
- চাইংগ্যাচানাগু শহরে ডাকা হত "দৈংনাক"

বাংলাদেশে দৈংনাক "তঞ্চঙ্গ্যা" আর উনার ভাষায় তঞ্চঙ্গ্যা শব্দটি যেভাবে এসেছে ঃ- চাইক্য - চাকমা - দাগং - দৈংনাক - তঞ্চঙ্গ্যা। তিনি এগুলোর আরও বিভিন্ন বিস্তারিত বর্ণনা দেন। আর যথার্থ যুক্তির মাধ্যমে নামকারণটা শক্তভাবে স্থাপন করেন। তিনি কক্সবাজারে বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায়কে "তঞ্চঙ্গ্যা" নামে অভিহিত করার মূল কারণ হল "ভাষা"। বার্মায় যারা তঞ্চঙ্গ্যা বাস করে এরা নাকি কথা বলার সময় বার্মিজ শব্দ প্রবেশ করিয়ে কথা বলেন আর ভারতেও নাকি একই অবস্থা। তিনি রাঙ্গামাটি কিংবা বান্দরবানের আসলে হয়ত বাংলাদেশের তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার পরিবর্তনটা বুঝতে পারতেন। তবে একথা সত্যি যে, Languise is not Stand Stile. ভাষা চলতেই থাকে পরিবর্তনের দিকে। শিক্ষিত নামধারী ব্যক্তিরাই ভাষাকে পরিবর্তন করার মূল কারিগর। সেটা যেকোন সম্প্রদায়ে শিক্ষিত ব্যক্তি হোক না কেন?

কক্সবাজারে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করছে পূর্বে তা বনাঞ্চলে আবৃত ছিল। বর্তমানেও কিছুটা বনাঞ্চল দেখা যায়। বসতি প্রাথমিক পর্যায়ে বনজকাল পরিষ্কার করে চাষযোগ্য জমি তৈরি ফলমূলের বীজ বপনকরে প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষি কাজ শুরু করে। বসতি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিনিয়ত বন্য হিংস্র পশুর সাথে সংগ্রাম করে তাদের জীবন ধারণ করতে হত। সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস থাকত প্রতিনিয়ত। তাই নিরাপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাতে নিজেদেরকে রক্ষা করবার জন্য সমতল উচু করে কাঠের টং ঘর তৈরি করে বসবাস শুরু করে। বর্তমানও গুটি কয়েক ঘর-বাড়ি ব্যতিত সকল ঘরই কাঠের তৈরি টং ঘর। তখন যার যতটুকু জমি প্রয়োজন পরত ততটুকু জমি নিতে পারত। ফলে এককালে তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রচুর জমি-জমা ছিল। কিন্তু কালক্রমে সামাজিক

ও রাজনৈতিক কিংবা জাতিগত চালের দ্বারা তঞ্চঙ্গ্যাদের আগের মত জমি-জমা নেই। যতদুর জানা যায়, আগে কক্সবাজারে তঞ্চঙ্গ্যারা একটা জায়গায় বা অঞ্চলে বসবাস করত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে কক্সবাজারে বর্তমান ১১টি গ্রাম আছে। এ গ্রামগুলো কক্সবাজার জেলাধীনে টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় অন্তর্গত। উখিয়ায় অন্তর্গত চারটি গ্রাম হলো- মনখালী, মাদারবনিয়া, তেলখোলা, ও মশাখোলা। বাকি সাতটি টেকনাফ উপজেলায় অন্তর্গত। এগুলো হলো ঃ- শিলখালী, হরিখোলা, লম্বাখোলা, দৈংগ্যকাটা, কাটাখালী, আমতলী ও পুটিবড়িয়া ১১টি পাড়ার মধ্যে প্রায় ২০,০০০ তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী বসবাস করে। ঘর-বাড়ির দিক দিয়ে ৩,০০০-৪,০০০ হাজার ঘর-বাড়ি রয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষার হার দ্রুততার সাথে বাড়তে না পারলেও অন্তত আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্যতাই এ জনপদের উত্তরণের মূল বাধা-বিপত্তী বিষয়। আর্থিক সংকটে কারণে বাকি ছেলে-মেয়েরা অধ্যয়ন করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও বর্তমানের লেখাপড়ায় মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বাধা-বিপত্তী অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। সংখ্যায় কম হলেও বর্তমান উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে অধ্যয়নরত আছে এ জনপদ থেকে। ধীরে ধীরে বাড়বে বলে আশা করা যায়। আর কলেজে অর্ধশতার্ধিক ছেলে-মেয়ে অধ্যয়নরত আছে। স্কুলে শত শত ছেলে-মেয়ে অধ্যয়নরত আছে। এদেরকে উত্তরণের জন্য যথাযথ দিক-নির্দেশনা আর আর্থিক সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। না হলে এদের সংখ্যা ও কমে যাবে। এ জনপদে অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। অন্যান্যরা কাঠুরিয়া, জেলে ও বিভিন্ন ধরণে খুচরা-পাইকারি ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত। কয়েকজন সরকারিও বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে।

এককালে বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক হিসেবে পরম প্রশান্তি ও আয়েসী জীবন-যাপন করতো। এক সময় যারা নিজেদের জমিতে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রম নিত। এখন তারা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জমিতে শ্রম দিতে হচ্ছে। প্রচলিত প্রবীণদের মুখ থেকে শুনা একটা কথা, তখন তঞ্চঙ্গ্যারা এতই প্রভাব খাটাতে পারত যে, অন্য সম্প্রদায়ে লোকদের কপালে নাকি সুপারি কাটত।

বর্তমানে বংশধরেরা অনেকটা সম্পদহীন হয়ে পড়েছে। আর এ মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি কমে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে-

- আয়েসী জীবন-যাপনে অব্যহত থাকা।
- অযাচিতভাবে দান করা।
- নবাগত বসতিদের দ্বারা জমি বেদখল হয়ে যাওয়া

- ভীতি ও লোভের প্ররোচনায় এক শ্রেণির নব্য ধনীর শ্রেণির নিকট জমি বিক্রি করা।
- দেশের প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ায় ও ভূয়া দলিলের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া ইত্যাদি।

ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই জনপদের মানুষ অনেক পিছিয়ে। তবে প্রত্যেক পাড়ায় একটি করে বৌদ্ধ বিহার আছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো রাখাইনদের নিয়মে পরিচালিত হয়। তবে এখন বড়ুয়া ভান্তে, চাকমা আর তঞ্চঙ্গ্যা ভান্তেরাই বেশি থাকেন। তাঁরা তাদের নিজস্ব নিয়মের মাধ্যমে সমাজকে পরিচালনা করেন। বৌদ্ধ বিহার দেখাশুনা করার জন্য কমিটি রয়েছে। যা পূর্বে ছিল না। এখন নবজাতক শিশু নাম করণ ক্ষেত্রে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করেই নাম রেখে দেওয়া হয়। আর তাই নাম ও নামের টাইটেল পরিবর্তন করা হচ্ছে। তবে বিভিন্ন জায়গায় বাধা-বিপত্তী কথা চিন্তা করে নামের টাইটেলটা পরিবর্তন করা যাচ্ছে না।

সামাজিক ব্যবসাও খুবই অনুন্নত। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করতে হলে এটাই মানুষের মেনে চলতে হয়। যদিও এ নিয়মের বাইরে কেউ বলে না কিন্তু একাত্ববোধতা কারোর নাই। পারিবারিক কলহ, ভুল বোঝাবোঝি এ অন্যের প্ররোচনার মাধ্যমে বর্তমান সমাজ-ব্যবসা আরও নিম্নে দিকে ধাবিত হচ্ছে। বর্তমানের সমাজের মধ্যে একতা কথার মুখে আনাও কোষের পরিণত হয়ে যায়। তবে এমন মন-মানসিকতা থেকে বেড়িয়ে আসা একটাই পথ আছে সেটি হল শিক্ষা। যদি সমাজে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি উত্তরণ হতে পারে তাহলে সমাজে একাত্ববোধ আনা সম্ভব। আর সমাজকেও উন্নয়ন করার সম্ভব। শেষ কথায় আছি। কক্সবাজারে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় মানুষরা স্বতন্ত্র ও স্বকীয় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে আসছে। তবে এগুলো পরিপূর্ণ নয় বলে স্বীকার করা যায়। এগুলোকে পরিপূর্ণ করতে হলে আমাদের লাগবে সাহায্যের হাত। যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওযা যায় তাহলে পরিপূর্ণ তঞ্চঙ্গ্যাদের আদলে নিয়ে আসতে পারব এ অঞ্চলে তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে। কয়েকটি পদক্ষেপ নিলে ভাল হবে যেমন ঃ-

- পোশাক-পরিচ্ছদ শিখাতে পারে এমন কয়েকজন পেশাদারদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।
- সাংস্কৃতিক বলতে শুধুমাত্র পোশাক-পরিচ্ছন্ন নয় এর সাথে গানও নাচ শেখানোর জন্য ব্যবস্থা করলে হয়ত অনেক প্রতিভাবান শিল্পীও উঠে আসতে পারবে।

উক্ত দু'টা বিষয় খেয়াল করলে অনেক উপকৃত হবে। আর পুরোপুরি বিনামূল্যে নয়, অর্থাৎ স্বল্প খরচে এগুলোর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করার বিজ্ঞ মহলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি কামনা করছি।

পরিচিতি ঃ ছাত্র, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তেন্দ্রার বুইদ্ধি

(প্যাঁচাল বুদ্ধি)

কথিকা ঃ রম্ভাপুদি তঞ্চঙ্গ্যা
কুতুবদিয়া, বিলাইছড়ি

১.

বুউত্, বুউত্ আক্কি দিনত্ তঞ্চঙ্গ্যা মালত্ এক্খান আদামত্ ভেছেরা নাঙে এক্কআ মানোইত্ আল। তাত্তুন আলছে দিবা মরত্ পআ, এক্কআর নাঙ আছলা আর এককআ তেন্দ্রা, তেন্দ্রা উলদে দাঙঁর ভাই। দি ভাইয়ে দাঁঙর উইয়্যন্। তারা বাবে ভেছেরা বুড়া ওইনে মুরি গেল। তেন্দ্রা আছলা একঘরত্ থান্। তারাত্তুন বাবঅ দিন্ন্যা সম্পত্তি আলদে-

১ কান রজাই

১ কআ দাবা

১ কান তাঅল

১ কআ গাই গুরু

১ কআ নারিকুল গাইত্

তেন্দ্রা আ আছলা দিজনত্তুন তেন্দ্রা উলদে চালাক, আ আছলা উলদে ন মাইত্চ্যা বেদমা। স্যেনে চিঅন ভাই আছলা এক্কুই তা দা তেন্দ্রা চিঅত্ থ য়্যে / ন-পারে।

জার কালত্ তেন্দ্রা রাইত্তআ রজাই গাত্দি ঘুম যায় আ আছলা রাইত্তআ দাবা খায় খায় থায়। আত্তইন জালি আত্তইন পুচাত্ বোই থায়। দিনত্ তেন্দ্রা দিন্নআ দাবা খায় আছলা তাঅলানদি দিন্নআ কাম গরে। দি ভাইয়্যে বাবদিন্ন্যা গুরুবা সংসং গুরি ভাগ গুইল্ল্যাক। তেন্দ্রা লুলদে পুন কাইত্তি কত্তাবা। চিঅন ভাই আছলা পালদে মাধা কাইত্তি কত্তাবা। আছলা দিন্নআ যত্নগুরি কইত্তগুরি গুরু চড়ায়। গুরুবার এক্কআ ছ ওইয়্যে। দুধ দুইবার সময় ওইয়্যে। পুত্তি বিন্ন্যা তেন্দ্রা গুরুবাত্তুন দুধ দুইনে খায়। মহর চিঅন ভাই আছলারে ভাগনদে। আছলাঅ আ কী গুরিব। সিদা ন মাইত্স্যা মানোইত্। আজার ওক তেন্দ্রা ওলদে একমার পেদর ভাই। আক্কলে বুইদ্বিয়্যে দরমর। কধা কুলেঅ তা সমারে ফরে ন আইস্যে। সেনরলাই ন মাদি চুগ্ গুরি অঙগুরি থায়। আদাম্যা পাড়াল্যা মানোইত্ষ্যুনত্তুন আছলার অবইত্তা দিহিনে

চিত্‌পুইল্‌ল্যে। তারা বুইদ্ধি দিলাক্‌কে দিন ভায়ে যহন রজাইআন তর; স্যেনে তুই দিন ভায়ে যেনে মনে কয় সেনে গুরি পারইত্‌। আছলা বুচিল দে অয়দে-না।

একদিনা বিল্‌ল্যা বিল্‌ল্যা আছলা যহনে রজাইয়্যান লোই ঘরত্তুন লামের লোই সেক্কে তেন্দ্রা পুছা গুইল্‌ল্যে কুধি য-ত্তে? আছলা কুলদে "ধুবার লাই নিচাঙত্তে।" সেক্কে তেন্দ্রা কুলদে থোক ধআ ন পুরিব। রজাইয়্যান্‌লোই দি-জনেঅ ঘুম যাই পারিবং। তেই চিত্তুন লাউদি আছলা জারকাইল্‌ল্যা রজাই গার্দ্ধি ঘুম যায় পারে।

আছলা মাইন্‌ষ্য কধা শুনিনে যে-এন কাম গুইল্‌ল্যে দিহিলদে তার লাভ ওইয়্যে। চিত্তুন লাউদি তে নিজরলাই চিদাগুরি কাম গরে। দাঅ কধা আহেদে, "আমন আন্দাইত্‌ আমনে বুছে।" "বেইগগি সিধা উলে-অ ভাত ন মিলে" আছলাঅ সি-কধা মনত্‌ গুরি চলে।

তেন্দ্রা বুইদ্ধি -২

একদিনা বিন্‌ন্যা মাধান তেন্দ্রা গুরুবাত্তুন দুধ দুয়ের। চিআন দিহিনে আছলা কাইয়্যা গেল। তে গুরুবার তা ভাগকআ মুচুঙান বাইজজাবার চার। তেন্দ্রা মাইত্‌ পাইনে দুয়াদি মানা গুইল্‌ল্যে উইয়্যে উইয়্যে থোক ন-বাই-জ্জ্যাইত্‌। তরে দুধ ভাগ দিন।"

তেন্দ্রা বুইদ্ধি-৩

বাব দিন্‌ন্যা সম্পত্তি এক্‌কআ গুরি নারিকুল গাইত্‌। তেন্দ্রা আছলা ভাগ গুইল্‌ল্যাক। তেন্দ্রা লুলদে আহা কত্তাবা আ আছলারে দিলদে ধুছা কত্তাবা। নারিকুল গাইছ্যইত্‌ নারিকুল ধুরি পায়ি পায়ি আহন। একদিনা তেন্দ্রা নারিকুল পারিবারলাই গাইছ্যইত্‌ উইত্‌ছেহোই। মাইত্‌ পাইনে আছলা দুআ-দুয়ি যায় তা-অলানলোই নারিকুল গাইত্‌ছআ কাবা ধুইত্‌জ্যে। গাইত্‌ কাবানা র শুনিনে তেন্দ্রা তলেদি রিনি চালঅ। তেন্দ্রা দিহি, "ঈশ ঈশ শেত্‌ র গুরি দু উল্‌ল্য, আছলারে ডাইনে কুল, ও ভাই ন-কাবিত। গাইত্‌ছআ পুলেদ মুই মুলুং। ন-কাবিত্‌, তরে নারিকুল ভাগ দিন।"

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ৪

গুরিব পআ তেন্দ্রা আ আছলা। মাইন্‌ষ্য চিঅত্‌ কামাই কুদায় খায়দাই বাঁচি থানা। একদিনা তেন্দ্রা আছলারে কুল। "আদামত্‌ গুচাং বুইজ্যাত্তুন্‌ কাম্মআ লায়ের বিলি কুইয়্যে। যাইদেনে কামগরা?" আছলা যাইন বিলি কুল।

আছলা বুইজ্যা চিঅত্‌ গেলে বুইজ্যা কুলদে একখান কদা মানা পুরিব, তুই যুদি ম-সমারে ন পারইত মুইত বাংচুককআ খুলি ফেলাইন আ মুই ন পাইল্‌ল্যে তুই ম বাং চুককআ খুলি লোইত্‌।"

বুইজ্যা কুল, "তিন আঙুল্যা কলা পাদা-দেদে কুলে দেদে ভাত, না-না কুলে ন দিত্ ভাত।" মাইনি তিন আঙুল্যা কলা পাদাত্ তরে ভাত দেআ উব। চিঅন পাদানত্ ভাত দিলে এককেনা গুরি দিলেঅ পুরি যাইহোই। সেনে আছলাত্তুন নানা কআ পরে। আ না কুলে নদিত্ ভাত বিলি দেআ নঅয়। দেদে কুলে আর দেআ অয়। ন আদিলে না-না কুলে দেআ নয়। ইদিক্যা গুরি আছলা বেচারা পেঁঠ ভরণ ভাত খায় ন পারি দিন্নআ কাম গরা পরে। সাত্তামুলা কাম গরানার পরে আছলা মেরেআ ওইয়্যে। তে বুইজ্যারে কুল, মুই আরথাই ন পারিন। তুই ম বাং চুক্কআ কআই-ল। চুক্তি ধয়ে বুইজ্যা কআই লুল আছলার বাং চুক্কআ।

আছলা এক্কআ চুক লোই ঘরত্ গেল। তেন্দ্রা দিহিনে পুছা গুইলল্য। আছলা বেআক্খান ভাঙি কুল। আছলার কধা শুনিনে তেন্দ্রা কুল, সেন্নে ছালে। দেআ যোক কোইনে ঠিক গুইল্ল্যদে এবারা তে যাবদে বুইজ্যা চিঅত্ কাম গরা।

তেন্দ্রা গেল বুইজ্যা চিঅত। কাম গুরিবার আক্কি বুইজ্যালোই চুক্তি উল। "তিন আঙুল্যা কলাপাদা দেদে কুলে দেদে ভাত, নানা কুলে নদিত ভাত" কাম গরানার পরে তিন আঙুল্যা কলাপাদাত্ তেন্দ্রারে ভাত দিবার লক্কে তেন্দ্রা কয়দে দে আর দে। সেনে দিদে দিদে এক পেলা ভাদে ন কুলাই, আর রানা পরে।

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ৫

একদিনা বুইজ্যা তেন্দ্রারে কুলদে, কাইল্ল্যা বিন্ন্যা উই জ্বালাউন (ধানের বীজ) ফেলাইত্তোইদে? তেন্দ্রা কুলঅই। তাপরে দিনা গদা একভার জ্বালা লোইনে গেল। তে সুন্দর গুরি তৈয়ার্জ্যা ভুইয়্যইত্ ন ফেলাইনে ফিল্ল্যহোইদে বেআক্কুন ঝারত্ (জঙ্গলে) ঘরত্ আলে বুইজ্যা, কুল/পুছা গুইল্ল্য, ক্যান, গমে ফেলাই ওইত্তে নে? তেন্দ্রা কুল হঁ। গমে ফেলাইঅংগোই।" তা পরে দিনা বুইজ্যা যাইনে দিহিলদে- বেআক জ্বালাউন তে ঝারত্ না ফেলাইয়েহোই! রাগেচাগে ঘরত আইনে তেন্দ্রারে কুলঅ "তুই জ্বালাউন কুদি ফেলাইওইত্ তোইদেই?" তেন্দ্রা কুল "আ তুইনা ফেলাবারলাই কুইয়্যইত্! বুইজ্যা কুল, ও মরার বেকুপ!

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ৬

একদিনা রাইদত্ দি-এককালাং (খাসা) ধান দেয়াইনে বুইজ্যা তেন্দ্রারে কুল, কাইলল্যা উই ধানুন বানিত্ তোইদে। তেন্দ্রা কুল হঁ (সম্মতি)। তারপরে দিনা তেন্দ্রা পুরা দি কালাং ধান লোইনে তেঁতুইল গাইছর তলে বুইত্স্যেহোই। তে চিঅত্ চিঅন

চিঅন দুরিদি ধানুন বানা ধুইত্জ্যেওই। পুরা দিন্নআ গেলহোই। ত-তেন্দ্রা ঘরত্ ন আইস্যের। বিল্ল্যা বিল্ল্যা গুরি বুইজ্যা তেন্দ্রারে তআ লাম্মে। লাকপালহোইদে তেতোই গাইছ্যত্তলে। তেহি ধানুন নি-গুরি চিঅন দুরিলোই এক্কআ এক্কআ গুরি বানি বানি আহে। বুইজ্যা কাইয়্যা যাইনে কুল, "ওপরা কবাইল্ল্যা কী গরঅত্তে?" তেন্দ্রা কুল, "আতুইনা বানিবারলাই কুইয়্যইত!

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ৭

বুইজ্যা চিঅত্ থাইদে থাইদে জুম কাবিবার অক্ত উল। বুইজ্যা তেন্দ্রারে জুম কাবা পাধা-ল। জুম কাবা উল। সময় উলে জুম আওইন দেআ উল। একদিনা বুইজ্যা তেন্দ্রারে কুল, তুই ন আ জুমত্ একখান ঘর বানদোই। জুম কাম গুইত্ত্যে দ জুমত্ থা পুরিব।

তারপর দিনা তেন্দ্রা জুমত্ গেল। জুম ঘর বানি-ল। বিল্ল্যা ঘরত্ আইন্যে বুইজ্যারে কুল, ঘর বানা ওইয়্যে। তারপর দিনা বুইজ্যা, বুড়ী আ তেন্দ্রা জুম ঘরত্ পরং উবারলাই লক্দিলাক। জুম কাইয়্যা জাইনে তেন্দ্রা বুইজ্যারে কুলদে, ও বুইজ্যা, কুউরর আরে আক্কি যাবার ন-দিত্। ঘ-রান খাবওইস্যা। বুইজ্যা চিদা গরেত্তে তেন্দ্রা আ কিধিক্যা ঘর বানিল। তারা নআ জুমত্ লুইলাক্কোই। বুইজ্যা তেন্দ্রার বাইন্যা ঘরান দিহিনে বেকুপ উল! তিন্নআ খুইত্স্যা পারাইনে চাল জিয়েদে একখান্ পারবআ দুর চআলাক।

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ৮

আষাঢ় মাইত্স্যা দিন। বুইজ্যা আ তেন্দ্রা ভাছুরী তআ গেলাক। বুইজ্যা ভাছুরী তআই আনি একখান জাহাত থয় আ তেন্দ্রা বোই বোই চিউন সুলে। ভাছুরী সুলিদে সুলিদে তেন্দ্রাত্তুন বুইদ্ধি উদিল। তে কী গুইল্ল্যে কালাঙ তলাত্ বোইনে তা মাধা উবুরে বেআগ ভাছুরীউন কালাঙত ভরাই চুগ গুরি বোই রুল। বুইজ্যা জাহাত্ ফিরি আইনে তেন্দ্রারে লাক-ন পাই খুব ধাই চাল। তেন্দ্রারে ক-ন-অ- মাত ন পা-ল। বুইজ্যা তেন্দ্রারে কধা চিদা গুইত্তে ভাছুরী কালাঙঙআ ইচর মাধাত্ থোইনে দাবা খা ধুইজ্যে। সিলক্ষে বুড়ী পুছা গুইল্যে বুড়ীরে কুলদে বাঘে খাইয়্যেহোই। সিলক্ষে তেন্দ্রা ভাছুরী কালাঙত্তুন জআ পারি ফালমারি উদিনে কত্তে ন খাইয়্যদো। বুইজ্যা কুল, "মরার তেন্দ্রা চিআন্নে গরত্তে?"

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ৯

আর ৩/৪ দিন পরে বুইজ্যা তেন্দ্রারে কুল, যেই, ভাছুরী তআ যেই। তেন্দ্রা আ বুইজ্যা ভাছুরী তআ গেলাক। বুইজ্যাত্তুন তেন্দ্রা বুইদ্ধিআন মনত্ উদিল। ভাছুরী তআনা কদ্দুর উলে বুইজ্যা তেন্দ্রারে কুল, তুই তআহোই ইবার মুই সুলং। তেন্দ্রা বুইজ্যার কধা মানিল। তেন্দ্রা ভাছুরী তআরলোই। ইনদি বুইজ্যা কি গুইল্য? ভাছুরী সুলী ফুরাইনে তে তেন্দ্রা ধক্যা গুরি কালাঙআ তলাত্ বোইনে তা উবুরেদি ভাছুরী উন দিয়ে। চিআন গুইত্ত্যে উনদি তেন্দ্রা দিক্ক্যে। পিছে তে ভাছুরী লোই আইত্তে আইত্তে চিদা গুইল্ল্যদে, বুইজ্যারে আইত্স্যা খেলা দেহাইন। কালাঙ কুড়ে আইলে ইক্কিনা তআইআ ভাছুরীউন সুলিল। সুলি সালি কালাঙত্ ভরাল। তা পরে কালাংআ বোইনে ঘরমুক্যা লক দিল। আইত্ত্যে আইত্ত্যে বুইজ্যারে দুগ দিবারলাই তে ইচ্ছা গুরি অয় নয় ঘন ঘন আছার খাল। তে পুত্তিবার আছাড় খাইদে ভাছুরী কালাঙআ বুগ বুগ গুরি মাদিত্ পুইল্যে উনদি বুইজ্যা দুগ পায়। কিন্তু তেন্দ্রা মাইত্ পাব বিলি বুইজ্যা দুগ পালেঅ অংগুরি চুগগুরি থায়। ইনদি সক্কে ঘুরুতুরু করদের। তেন্দ্রা ঘরত্ লউনে ভাছুরী কালাঙআ থুলদে জুর গুরিনে বুগ গুরি সাদিনালত৷ বুড়ীরে তেন্দ্রা পুছা গুইল্য বুইজ্যা ঘরত্ আইত্স্যে দেনে? বুড়ী কুল কোই ন আইস্যেদ। তেন্দ্রা কুল, ঈ তেদ মরে ফেলাই আইতস্যে। এধক্ দাইনেঅ মাত্ ন পাঙ। না বাঘক্যা জু পাইয়্যে কি জানি।

ভাছুরী কালাঙআ আইত্স্যা একরাইত সাদিনালত্ থোক্। ভাছুরী উন ধোইযান পারা। বুড়ীঅ কুল, থোকনা। বেচারা বুইজ্যা ত ভাছুরী কালাঙত্তুন ন উদে। উন্দি য্যেন পধে পধে আষারান খায়দে খায়দে আধামরা। তা উবুরে সাদিনালত ভিচানা। তেন্দ্রা আ বুড়ী খাইদাই ঘুমত্ পুলাক। সক্কেনে রাইত্ গুভীন উইয়ে সক্কেনে কালাঙ ভিদিরেত্তুন মরা মরা কানং কানং র গুরি বুড়ী-নে ডাইনে বুইজ্যা কুল, ও বুড়ী, মরে তুলছি।

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ১০

তেন্দ্রা একদিনা বুইজ্যারে খবর এক্খান কুলধে, চিবুন্ন্যার পআ ধুরুন্ন্যা ১০০ টেঙাদি একখান ন আ লুংগী কিন্ন্যেদে চিআন পিনিলে গদা রিচাভ বাম দেআ যায়। বুইজ্যা গমে পুছা গুইল্ল্য, কী দেআ যায়? তেন্দ্রা কুল, রিচাভ বাম। শুনিনে বুইজ্যাত্তুন সি রংগীআন চাবার মনে কুল, তেন্দ্রারে কুল, তুই মে দেআই পারিবে? তেন্দ্রা কুল, পারিন। মহর ১০০ টেঙা দেআ পুরিব। আ বাম দিহিনে রাগ বেচার ওই ন পারিবে। বুইজ্যা কুল, ঠিক আহে।

তেন্দ্রা, বুইজ্যা দিয়া টেঙাউন নিজে রাহা-ল। ওই লুংগীআন বুইজ্যারে দেআবারলাই আনিল। ভিদিরে কন কাবর ছাড়া লুগীআন পিনিনে বুইজ্যারে ডায়িল, ও, বুইজ্যা, চাচিয়্যা, এইয়্যা লংগীআন। বুইজ্যা কাইয়্যা আল। তেন্দ্রা ঠিআইনে ঠেঙুন এককেনা ফাঁক গুরিনে ডানে বামে ধুলের। বুইজ্যারে কুল, দিকক্যাইত্তে? বুইজ্যা তেন্দ্রার কমরত্ গম্ গুরি একবারি দি কুলধে, চিবাদ ত গত্তনাবা। কুইয়্যা রিচাভ বন? তেন্দ্রা কুল, মে চানা। বুইজ্যা তেন্দ্রার কমরান যিনদি ধুলে তা মাধাবায়্য চিনদি গুরি গমে রিনি চার। তেন্দ্রা স্যেনে কুল, মাইনস্যে কনধে, সইত্তার তিন অবইত্তা। এ্যাইয়্যাই।

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ১১

তেন্দ্রা একজন ঘরত কাম্মআ রুল। তা নাঙান কুলদে জামাই। জামাই য়্যে গিরিত্তআ ঘরত্ কাম গরে। খাইদাই চিঅত্ থাই। দিন যার, মাইত যার। কাম্মআ জামাইয়্যে (তেন্দ্রা) দিহিলদে তা গিরিত্তআবাত্তুন আহেদে সুন্দর এককআ মেলাপআ। গাবুর মেলাপআ। তেন্দ্রাত্তুন সি মেলা পআবারে লুবার মনে কুল। একদিনা বিল্ল্যা বিল্ল্যা সি গাবুর মেলা পআবারে গাই গাই পাইনে ধুরিনে বাঁ-রাত তুলি নিচার। মেলা পআবাই কিচাক্কারি উদি মানোইত্ জন লড়াই আলাক। পাড়া মাইন্স্যে লড়াই আলাক। মেলা পআবাই কানি কানি কুল, জামাইয়্যেআ মে বাঁ-রাত তুলি নিচাত্তে। বেয়াক্কুনে জামাইয়্যরে মারি-পিদি বানিলাক। বানি বুনি সুধা ফালি ভিদিরে ভরাইনে কাইন্যা মাধাত্ বানি থুলাক। খাইদাই আইনে কাইন্যাত্তুন লাধিমারি তারে গুভীর গাঙ পানিত ফেলাই দিবাক। চিআন চিদা গুরিনে বেয়াক্কুনে যা ঘরত্ তে গিঅন্দোই।

ঠিক সিলক্ষে এক্কআ গুরু চরাইন্ন্যা পআ গুরুলোই ঘরত্ ফিরের। গুরুচরাইন্ন্যা পআব তা কাইয়্যা আলে তে শুনে পারা তেন্দ্রা কুল, মুই রাচা ঝিনলোইন। গুরু চরাইন্ন্যা পআবা তা কাইয়্যা আলে তে শুনে পারা তেন্দ্রা কুলদে, মুই রাচা ঝি বা ন-লং ত রাচা ঝিবা দিবারলাই মরে বানি থুইঅন্দে। পআবাই কুল, অইনি? তেন্দ্রা কুল, অয়দেদেই-তুই পালে লুবেনে ক? পআবাই কুল- লোইন, খামাক্কাই লোইন। তেন্দ্রা কুল, লুলে ছালে ইনদিআই, ম-ধক্ক্যা থাইনে তত্তুন লোইন লোইন কআ পুরিব। দে বানানি খুলিদে। মুই তরে দিশা গুরি জং। বচঙ্যা পআবাই তেন্দ্রারে বান খুলিদি ছাড়ি দিল। তেন্দ্রা বদলে তে খাসা ভিদিরে সুমাল।

তেন্দ্রা ঠাসা গুরি বানি দিল। তা পরেনদি এক্কোই লাধি দিনে গুভীং পানিত্ ফেলাই দিল। পআবা ভাসি যাইনে মুরি গেল। তেন্দ্রা সুন্দর গুরি গুরুউনলোই পাড়াত্ গেল। পাড়া মানুইত্ষ্যোন্ আমক্ উলাক। তারা চিদা গুইল্ল্যাক্কে, এধক্ জনে দরমর গুরি বানিনে জামাইয়্যে ক্যানে ছুড়ি আন; তে নিশ্চয় মন্ত্র জানে। সেনে তারা ডরালাক্ - যি মেলাপআবার কারণে তারে মাইজ্যন, বাইন্ন্যন্ সি মেলা পআবারে আ তা বাবরে বুচালাক্ জামাইয়্যরে জামাই ইসাবে মানি-ল।

তেন্দ্রা বুইদ্ধি - ১২

যি বুইজ্যা চিঅত্ তেন্দ্রা কাম গরে সি বুইজ্যা বুড়ীরে কুল, "বুড়ী যেই সেযই ইত্তুন বুউত্ দূরত্ ধাই যেই। তেন্দ্রালোই ন পারিব। বেআক্ শেত্ গুরি দিব। কুলা ল, পেলা ল, তোলাইয়্যান মুইলোইন যেইগোই।" উনদি বুইজ্যা কথাউন তেন্দ্রা বেআক শুনি আহে। স্যেনে তে চুগ গুরিনে তোলোই বনা ভিদিরে সুমাই আহে ওই। বুইজ্যা বুড়ী বুউত দূরত্ ধাই যাবাক। বুড়ী চোল লুল, পেলা লুল, বুইজ্যা লুল তোলোইয়্যান যাইদে যাইদে আদাম ফেলাই অন্য আদাম, সি আদাম ফেলাই আর এক আদাম কাইয়্যা একখান জাহাত্ লুক্ক্যন্দোই। তারাত্তুন পেঠ পুরি উদিল। স্যেনে তারা জিরালাক। বুড়ী ভাত চন রানিবার জুউলার। বুড়ী রানিবারলাই পেলাত্ চোল লুবার লক্কে কুল, মুই এক মালা, বুইজ্যা এক মালা; এ-কথাআন শুনিলে তেন্দ্রা তোলোই বনা ভিদিরেত্তুন দাঙরগুরি কুল, আ-মুই এক মালা।

সংগ্রহে- লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা
রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি।

গুল চুয়ী

- অজিত কুমার তন্‌চংগ্যা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। ১৯৬২ কি ১৯৬৩ সন। দুই বান্ধবী চাঁন্দবি ও রেজন মালার মধ্যে খুব সখ্যতা ছোট বেলা থেকে। প্রকৃতির নিয়মে যৌবন প্রাপ্তির পর দুই জনে দুই সংসারে বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছে কাছাকাছি দুই গ্রামে। এর মধ্যে চন্দ্র কুমারের স্ত্রী চাঁন্দবি অন্তসত্ত্বা হলো। লজ্জা আর খুশী মাখা মনে স্বামী চন্দ্র কুমারকে জানায় সে। চন্দ্র কুমার এসেছে তিন দিনের সাপ্তাহিক স্কুল ছুটিতে। চাঁন্দবির চোখগুলো গোল গোল বলেই বিবাহের পর চন্দ্র কুমার প্রায়ই সময় বলতো - "তোমার মেয়ে হলে তার চোখগুলোও তোমার মত গোল গোল হবে - তার নাম রাখবো "গুল চুয়ী"। তখন চান্দবী খুবই লজ্জা পেত। সেই গ্রামের এক যুবক কমল জয় এর সাথে পূর্বের পরিচয় সূত্রে চান্দবির মাঝে মধ্যে পথে ঘাটে দেখা হত, আলাপ হত। সেই গ্রামের দেবর শ্রেণির অন্যান্যদের মতই মাঝে মধ্যে ঠাট্টা-মসকরা করে সরল মনে। তাদের মেলা মেশার মধ্যে কোন কলুষতা ছিল না। বাল্য সাথী হিসেবে মনের মিল, তাই মাঝে মধ্যে এক আধ বার তাদের বাড়িতে আসে। এ আসা যাওয়া প্রতিবেশী সুরেন্দ্রের স্ত্রী অঞ্জনার চক্ষে ভাল নজরে আসেনি। একটু বাঁকা চোখেই দেখতে শুরু করে সে। আত্মীয়তাসূত্রে দূর সম্পর্কীয় দেবর। চাঁন্দবির স্বামী চন্দ্র কুমার অন্য গ্রামে বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সপ্তায় সপ্তায় বাড়ি আসেন। চাঁন্দবি আর কমল জয়ের মেলা মেশাকে ঐ গাঁয়ের বধু ধলোক্কোর ও অঞ্জনার মত আড় চোখে দেখে। অন্যান্য গাঁয়ের বধূদের বলে বেড়ায় তাদের মেলামেশা সম্পর্কে। স্বাভাবিক নিয়মে একদিন চক্ষু কুমারের কানে আসে। স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখেন। সত্যি সত্যিই কমল জয়কে একদিন তার ঘরে দেখতে পান চন্দ্র কুমার বাবু। সেদিন গাড়ি ধরতে একটু দেরি হওয়ায় রাত করে বাড়ি ফিরতে পেরেছেন তাকে। চন্দ্র কুমারের মনে সন্দেহের-দানা আরো ঘনিভূত হয়ে উঠে। এ নিয়ে স্ত্রীর সাথে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়। চাঁন্দবি স্বামীর আচার আচরণে রুক্ষভাব লক্ষ করে। শনিবার সকালে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার সময় কেবল একটা বাক্য মুখে এনেছিলেন; বলেছিলেন - "মান সম্মানের সাথে ও সাবধানে চাঁন্দবি যেন চলাফেরা করে" - এ বলে চন্দ্র কুমার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ছাতা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। যতদূর চোখ যায় চান্দবি নিরবে চেয়ে থাকে। এদিকে স্বামীর অস্বাভাবিক আচরণে ও যাবার বেলা স্বামীর বলা উক্তিগুলো বার বার চাঁন্দবির কানে বাজতে থাকে, আর ভাবে -"গত কালের ঘটনায় সত্যি সত্যিই রাগ করেছেন তার স্বামী।" কিছুদিন গত হলে চাঁন্দবি স্থির করল - "স্বামীর সন্দেহের ব্যাপারটা কমল জয়কে জানানো উচিত; নতুবা সমস্যাটা আরও বাড়তে পারে" কমল জয়কে একলা পেয়ে ব্যাপারটা খুলে বলে; আর অনুরোধ করে তাকে ভুল না বুঝার জন্যে। ঘটনা খুলে

বলায় কমল জয় মনে মনে খুবই মর্মাহত হল চাঁন্দবির জন্যে; কিন্তু কথায় বলে- "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়!" তাদের নিরিবিলিতে আলাপরত অবস্থা কুটিল মনা ধলোকো দেখে ফেলে। ধলোক্কোকে দেখে তারা তাড়াহুড়ো করে যে যার দিকে চলে যায়। এ ঘটনার পর থেকে চাঁন্দবি ধলোক্কোর কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করে। এতে ধলোক্কো আরও বেশী সন্দেহের চক্ষে দেখতে শুরু করে। তাদের আড়ালে কথোপকথন সম্পর্কে চন্দ্র কুমারের কানে তোলে ধলোক্কো। এতে কাটা-ঘায়ে নূনের ছিঁটায় পরিণত হয়। এরপর থেকে চন্দ্র কুমার স্ত্রীকে নানাভাবে মানসিক যন্ত্রনা শুরু করে দেয়। এতে তাদের মধ্যে বারে বারে ঝগড়া হয়, দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরতে শুরু করে। সহজ-সরল চান্দবির মন দিনে দিনে ভাঙতে থাকে। স্বামীর বিভিন্ন সময়ের কটুক্তি-কটুবাক্য চাঁন্দবিকে বিষিয়ে তোলে। অবশেষে এখনি শ্বশুর বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাবার বাড়ি চলে যায়। উভয় পক্ষের বাবা মায়েরা অনেক চেষ্টা করেও মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে আনতে পারলো না। অল্প শিক্ষিত ও অজ্ঞতার কারণে সন্তান সম্ভাবা হওয়ার কথা সে স্বামীকে ছাড়া আর কাউকেও জানায়নি; কেবল তার ননদিনী নীলংবিকে ইঙ্গিতে জানিয়ে ছিল। পাঁচ-ছ মাস বাপের বাড়িতে নিজেকে বোঝা মনে করে সে বেশী দিন থাকলো না। চির কল্যাণকর বান্ধবীকেই সে একমাত্র ভরসা মনে করে বান্ধবীর আশ্রয়ে চলে গেল। মিশন স্কুলে দীর্ঘ ৬ বৎসর একই হোস্টেলে থেকেছে তারা। পরস্পর পরস্পরের খুবই ভাল বান্ধবী। মেয়ের অসহাত্বের অবস্থা বুঝে তত বেশী জোড় দিয়েও বাড়িতে নেবার চেষ্টা বাবা ও ভাইয়েরা করেনি - ভেবেছে বান্ধবীর সাথে থাকলে হয়তো কিছুটা সংশোধন হবে।

বান্দবী রেজন মালার স্বামী স্থানীয় হেডম্যান। তাঁদের অভাব অনটন নেই। সালিশীর পর স্ত্রীর কাছে চাঁন্দবির অন্তসত্বার কথা জেনে ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন বিজয় কুমার হেডম্যান। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে চাঁন্দবির অজান্তে বেশ কয়েক বার বাক্-বিতম্ববাদ হয় তাদের। কিন্তু প্রাণ প্রিয়া বান্ধবীকে সে আশ্রয় দিবেই। সন্তান সম্ভবা চন্দ্র কুমারের স্ত্রীকে নিয়ে ঝামেলা হতে পারে বলে স্বামী বিজয় কুমার হেডম্যান নিজেরস্ত্রীকে বুঝালেন; কিন্তু স্ত্রী স্বামীর কথায় গুরুত্ব দিলেন না। বিজয় কুমার হেডম্যান চন্দ্র কুমারের বাবা; চান্দবির বাবা, দু'পাড়ার কার্বারী ও গণ্যমান্যদের ডেকে পাঠান। শালিস বসে; কিন্তু সমাধান হলো না বিজয় কুমারের অনুপস্থিতির কারণে। কারণ বেশ কিছুদিন হয় চন্দ্র কুমার আর বাড়িতে আসে না বলে বাবা জানান। ছেলেকে খোঁজ-খবর দিতে বাবার প্রতি আদেশ দিয়ে অমীমাংশিত ভাবে শালিসী কার্য শেষ করতে বাধ্য হলেন হেডম্যান। দিন যায়- চাঁন্দবির চেহারায়; চলনে বলনে ভরাপূর্ণিমার আভা সকলের দৃষ্টিতে পড়তে থাকে। একজন বিচারক হিসাবে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন হেডম্যান।

একদিন ভূমিষ্ঠ হল এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান। চোখ দু'টা গোল গোল বলেই হেডম্যান দুষ্টামী করে ঐ মেয়ের নাম রাখলেন "গুল চুয়ী"। শত কষ্টের মধ্যেও আনন্দ-বিষাদ মিশ্রিত মনে চাঁন্দবি ভাবতে থাকে- "কি বিচিত্র এ পৃথিবী! কি আশ্চর্য মিল তার স্বামী চন্দ্রকুমার আর হেডম্যানের মধ্যে!" তার স্বামীরও ইচ্ছা ছিল মেয়ে হলে "গুল চুয়ী" নাম রাখা হবে বলে। পরবর্তিতে অবশ্য চাঁন্দবি হেডম্যানের এ নাম দেয়ায় আপত্তি করেছিল। কেন তার আপত্তি তা বিজয় কুমার হেডম্যানের নিকট চাঁন্দবি কোনদিন ব্যক্ত করেনি। চাপা স্বভাবের কারণে মনের কথা মনেই রেখেছে সে। এরপর বেশ ক'বছর কেটে গেল। হেডম্যান নিজের প্রতিষ্ঠিত এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাঁন্দবিকে সামান্য একটা শিক্ষকতার চাকরি দিলেন। ছোট্ট মেয়েকে নিজ স্কুলে ভর্তি করালেন চাঁন্দবি। এখন বই পুস্তকের নীতি বাক্য বিষয় আশায় নিয়ে চাঁন্দবিকে ছেলে-মেয়েদের তথা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে বলতে হয়। অথচ নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়ে ভাবেন। অতি সাদা সিধে হলে পৃথিবীতে যে চলা কত দায়, নিজেকে কি ভাবে সংগ্রাম করে এ সমাজে চলতে হবে তা ভাবেন। আর মেয়েটিকে কি ভাবে ভবিষ্যতে লেখাপড়া করিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাবেন-এ চিন্তায় বিভোর হন তিনি। তার মেয়েকে কি ভাবে লেখাপড়া করিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাবেন এ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। প্রায় সময় মন মরা দেখে বান্দবী রেজন মালা বলেন" সব সময় মন মরা করে থাকিস কেন? দেখবে চন্দ্র কুমারের একদিন ভুল ভেঙ্গে যাবে ঠিকই। তোদের সংসার আবার জোড়া লাগবে।" কিছু দিন যাক, মেয়েটা কিছুটা বুঝুক-মেয়েটা যখন বুঝার মত বয়স হবে তখন আমার হেডম্যানবাবুসহ সবাই মিলে একদিন বান্দরবানে খুঁজতে যাবো এবং ব্যাপারটা সুরাহার ব্যবস্থা করেই আমি ছাড়বো, তুই একটু ধৈর্য ধর, নার্ভাস হবিনা! কারণ মেয়েটাকে যখন দেখবে তখনই তার রক্তের বন্ধনের কারণে সে ফিরে আসতে বাধ্য হবে- রক্তের টান বলে একটা কথা আছে না!" দিন যায় মাস যায়। রেজন মালার আশ্বাসে চাঁন্দবি কিছুটা সাহস পায়। মনকে মনে মনে শান্ত্বনা দেয়-কথাটার যুক্তি আছে। মনে সাহস এনে গুল চুয়ীকে সকাল বিকাল লেখা পড়ায় মায়ের মমতা নিয়ে দেখাশুনা করতে থাকে। হেডম্যান পরিবারের সাহায্যে থেকে নিম্ন শ্রেণি থেকে শুরু করে প্রত্যেক শ্রেণিতে খোপড়ায় ভাল করতে শুরু করে গুল চুয়ী। অবশ্য স্কুলে ভর্তি করানোর সময় তার মা নিজের নামের সাথে মিল রেখে নাম লিখিয়েছিলেন "চন্দ্রাবতী"। চন্দ্রাবতী হেডম্যান বাবুকে মামা ডাকে। হেডম্যান বাবুও নিজের বোনের মেয়ের মত আদর করে। যেহেতু নিজের মেয়ে নেই সে সুবাদে তাকে নিজ সন্তানের মতই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থান দেয়। হেডম্যান বাড়ি বলে কথা; অভাব অনটন নেই, চাকর বাকরের অভাব নেই, কিন্তু এ পরিবারের একটা সমস্যা হলো তাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই। এ নিয়ে রেজন মালা চাঁন্দবির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। হেডম্যান পরিবারে হারমনিয়ম, তবলা আর অন্যান্য

বাদ্যযন্ত্রের অভাব নেই; কেবল সাংসার জীবনের সৌন্দর্যের একচেটান স্বরূপ সন্তানের অভাব! নির্বংশের অসনিসঙ্কেত! অবসর সময়ে যে টুকু সময় পায় চাঁন্দবি তার ভান্ডারে যদ্দুর আছে তা মেয়েকে গান শেখান। হেডম্যানের সাহায্যে থেকে নিম্নশ্রেণি থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওবার সুযোগ পেল গুল চুয়ী। চাঁন্দবিকে নিজের প্রতিষ্ঠিত জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত করলেন হেডম্যান বাবু। মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার মানসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হল হেডম্যান বাবুর এক ভা উচ্চশিক্ষার সুযোগে মা আত্ম তৃপ্ত হলেন।

অপর দিকে চন্দ্র কুমার স্ত্রীর প্রতি অভিমানে নিরুদ্ধেশ হন। চন্দ্র কুমারের নিরুদ্দেশের কারণে বাবা মায়েরা খুবই মর্মাহত হন! এরই মধ্যে চন্দ্র কুমারের পরিবারের তরফ থেকে বহু খোঁজা খুঁজি করা হয়। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। অভিমানি চন্দ্র কুমার চড়াই উৎড়াই বহু সময় পার করে বান্দরবান শহরে উপ কণ্ঠে রেইচা নামক এক গ্রামে গৃহশিক্ষক হিসেবে আশ্রয় নেন। নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন "করুনাময়" নামে। সময় বহু বৎসর কেটে গেছে। বাবা মায়েরা ইহ জগৎ ত্যাগ করেছেন ইতিমধ্যে। চন্দ্র কুমার একটি বারও খোঁজ নিলেন না তাঁর স্ত্রী ও কন্যা সন্তানের। গৃহকর্তা অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি। অত্যন্ত সৎ লোক। কথা প্রসংগে জেনে নিতে চেষ্টা করেন তাঁর প্রকৃত বাড়ি কোথায়, ইতিপূর্বে কি করতেন ইত্যাদি ইত্যাদি ... ..। চন্দ্র কুমার পরিচয় দেন তিনি একজন চির কুমার, চির কুমাই থাকতে চান। সংসার জীবনে উৎসাহি নন বলে।

গৃহকর্তার ছিল হাঁস-মুরগীর খামার, পুকুরে ছিল মৎস্য খামার আর অঢেল শীতকালীন সীম বাগান-দেখে চন্দ্র কুমারের চোখ জুড়াতো। চন্দ্র কুমার অবসরে কাজের লোকদের সাহায্য করতেন। তা দেখে গৃহকর্তা নিষেধ করতেন। চন্দ্র কুমার কিন্তু স্বপ্রনোদিত হয়ে ঐ কাজগুলোতে লেগে যেতেন। এতে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন। তাঁর আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দেখে গৃহকর্তা তাঁকে বিনা মূল্যে চাষাবাদের জন্য কিছু জমি চাষ করতে দিলেন। প্রথম বৎসরই জায়গা বেছে বেছে কোন জায়গায় কোন ফসল হবে বেছে নিয়ে নানা শাক-সব্জি, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, মূলা, বেগুন, শীতকালীন সীম আরো নানা প্রকারের ক্ষেত করে গৃহকর্তাকে টাক লাগিয়ে দিলেন চন্দ্র কুমার। পরবর্তী বৎসর পরিত্যাক্ত মাঝারী আয়তনের দু'টি পুকুরে মাছ চাষের সুযোগ দিলেন গৃহকর্তা।দু'তিন বৎসরে প্রচুর ক্ষেত-ক্ষেতী থেকে আয় এবং মৎস্য খামারে বড় বড় মাছে পুকুরে ভরে গিয়েছে দেখে মালিক অবাক হলেন। এবং সে বৎসর শ্রেষ্ঠ মৎস্য খামারি রূপে স্বর্ণের মেডেল পেয়ে দেন উপজেলা থেকে। দেখতে দেখতে সেখানে তাঁর ১০ বৎসর চলে যায় জীবন খাতা থেকে। বাড়ির বৃদ্ধ ধার্মিক কর্তার বার্ধক্যাবস্থা। তিনি নিজে নিজে অনেক দিন ভেবে দেখেছেন এ কেমন লোক? যার নিজ হস্তে কঠোর পরিশ্রম করেও

কোন চাওয়া পাওয়া নেই- এ আসলে কে? .... উৎপাদিত শস্যাদির বেচা বিক্রির টাকা পয়সার হিসাব পাই পাই করে হিসাব দেয় অথচ নিজের ভাগের অংশের কোন টাকাই নেয় না .... তাই বৃদ্ধ একদিন তাঁর তিন পুত্রকে ডেকে ছেলেদের মতামত চাইলেন এবং মনের কথা খুলে বললেন- "দেখ বাবারা আমার অনেক বয়স হয়েছে, আর ক'টা দিন ওপর ওয়ালা রাখেন বলাতো যায় না ...। আমার বিবেক বলছে আমার আর সময় নেই। "করুণাময়" তো বিগত ১০/১১ বছর ধরে অনেক আয় রোজগার করিয়ে দিয়েছে, কেবল খেয়েছে-দেয়েছে কোন বিনিময়তো নেয় নাই। আমার বিবেক বলছে তাকে কিছু দিই। সৃষ্টিকর্তা তো আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন। তোমাদের তিন ভাইকে তো যা দিবার দিয়েছি। লাল্যাঘোনার পাঁচ কানি জমি থেকে পূর্ব-কোনার অংশের রাস্তায় লাগা দুই কানি "দান কবলা" করে দিবার আমার ইচ্ছা - তোমরা কে কি বল? তিন ছেলে এক বাক্যেই বলে উঠে- "আমাদের কোন আপত্তি নেই।" "করুণাময়ের" সততা, কর্মনিষ্ঠা, উদারতা, পরিশ্রমী ও সরলতাপূর্ণ আচরণে মুগ্ধ হয়ে গৃহ কর্তা তাঁকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন। গৃহকর্তা নিজে সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে জমির দানবলার কার্যাদি সম্পাদন করে এলেন।

আজ এ সুখের দিনে চাঁন্দবি ও মেয়ের কথা হঠাৎ করে মনে পড়ে যায় চন্দ্র কুমারের! সে আজ প্রতিষ্ঠিত খামারী; চাষাবাদ ছাড়াও সে এক সফল মৎস্য খামারি। রাস্তা সংলগ্ন জায়গায় একটি চার তলা বিশিষ্ট পর্যটন হোটেল তৈরি করেছেন চন্দ্রকুমার নাম দিয়েছেন "জিরানী হলা"। যার অর্থ "বিশ্রামাগার"। তাঁর আজ কাজের লোকের অভাব নেই। দিনে দিনে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়ে উঠেন। এখন চট্টগ্রাম-বান্দরবান রুটে দু'চার টা চেয়ারকোচ চলে তার। পর্যটন মৌসুমে প্রতি শীতে চিম্বুক পাহাড় আর নীলাচলে বেড়াতে যান তিনি। তাই দুই জন কর্মচারীসহ ড্রাইভারকেগাড়ী প্রস্তুত রাখতে বললেন। ভোরে রওনা দিলেন চিম্বুকের প্রাকৃতিক নিসর্গ উপভোগ করতে গিরিছায়া ও ছায়া বীথির তলে। চন্দ্রকুমার বাবু লক্ষ্য করলেন দূর থেকে এঁকে বেঁকে একটা খোলা জীপ পাহাড়ের উপর দিকে এগিয়ে আসছে। পিছনে একটা বিলাসবহুল বাস কাছে আসতে দেখা গেল। কতগুলো ছেলে-মেয়ে হৈহুল্লোর করে যে যার মতো উল্লাস করছে। এসেই তারা গাড়ী থেকে নেমে পথে গোটা ত্রিশেক যুবক-যুবতী। এ দিক ও দিক ঘুরে ফিরে প্রাকৃতিক নিসর্গঃ উপভোগ করছে। কারোর হাতে হাই পাওয়ারের ল্যান্সের ক্যামেরা, কারোর হাতে বাইনোকুলার, কারোর হাতে ভিডিও ক্যামেরা। যে যার পছন্দমত স্নেব নিচ্ছে। হাজার ফুট নীচের দৃশ্য বাইনোকুলার দেখছে। ভিডিও রীল অনর্গল চলছে তো চলছে। এক সময় তারা পরামর্শ করলো যে-যেখানেই যাকনা কেন বেলা ২.০০টায় তারা এখানে এসে জড়ো হবে লান্সের জন্যে।

চন্দ্রকুমার নিরব দর্শক হিসেবে হ্যালি প্যাডের মত এক কোনা থেকে লক্ষ্য করছেন আর মধ্যে মধ্যে সুরুট টানছেন। তাদের পরামর্শ মতো সবাই যে যার দিকে ইচ্ছেমতো ছড়িয়ে পড়লো। চন্দ্র কুমার লক্ষ্য করেন একটু ভীতু প্রকৃতির দুই ছেলে-মেয়ে দূরে কোথাও গেল না। কাছে কাছে ঘুর ঘুর করছে আর বনোফুলের উপর উড়ন্ত প্রজাপতির দলগুলোকে খুব কাছ থেকে স্নেব নেবার বার বার চেষ্টা করছে। তাদের চাল-চলনে আধুনিকতার ছাপ। ছেলেটার পরনে পেন্টের সাথে ফতুয়া আর মেয়েটা জিন্সর পেন্ট আর কামিজ পরা। ঘুরতে ঘুরতে একসময় একদম চন্দ্র কুমারের কাছেই এসে পড়ে। বাঁশ ঝাড়ের কাঠ-বিড়ালীর স্নেব নিতে গিয়ে হঠাৎ করে ছয়-সাট ফুট নীচে গড়িয়ে পড়ে যায় মেয়েটি। তার চিৎকারে ছেলেটি সেদিকে দেয় এ দৌঁড়! চোখের পলকে মেয়েটি পড়তে দেখে চন্দ্র কুমার ও স্থির থাকতে পারলেন না। গিয়ে দেখেন ছেলেটা মেয়েটাকে ধরে আস্তে আস্তে নীচ থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসছে। ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে যায় একটা ছোট্ট ঝোপে আটকানোতে। ঝোপে না আটকালে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট নীচে পড়ে প্রাণ হারাতো। উভয়ে থর্ থর করে কাঁপছিল। তারা বাক্ রুদ্ধ! চন্দ্রকুমার বাবু তাৎক্ষণিক গিয়ে মেয়েটাকে উপরে নিয়ে আসতে সাহার্য্য করলেন। হাতে পায়ে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল হাতে সামান্য ঘা হয়েছে, রক্ত ঝরছে। ছেলেটা কি করবে ভেবে উঠতে পারছিলনা। পাশের আসাম গাছের পাতা ছিঁড়ে হাতে কচলাচ্ছিল সে। চন্দ্রকুমার বাবু দৌঁড়ে গিয়ে নিজের "র্ফাস্ট এইড্ বক্স" খুলে তুলা দিয়ে কিছু ডেটল লাগিয়ে দিয়ে হালকা বেন্ডেজ করে দিলেন। মেয়েটা কাঁপছে দেখে চন্দ্রকুমার অভয় দিয়ে বললেন "ভয় পেয়ো না মা! মেয়েটির এ দশা দেখে চন্দ্রকুমারের পিতৃত্ব ভাব জেগে উঠলো! বিশ বছর আগের তার কন্যা সন্তানের দশা মনে পড়ে গেল-আর মন হুহু করে কেঁদে উঠলো! কখন নিজের অজান্তে মেয়েটাকে "মা" বলে সম্বোধন করে ফেরেছেন চন্দ্র কুমার বাবু নিজে বুঝতে পারেনি। আগেই বলেছি "গুল চুয়ী" এর ভাল নাম "চন্দ্রাবতী"। চন্দ্রাবতীকে মা বলে সম্বোধন করায় আবেগাপ্লুত হয়ে কখন তার চোখে অশ্রু এসে পরে। তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন চন্দ্রকুমার বাবু।

কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ছেলে পরিচয় দেয়- সে সদ্য ইঞ্জিনিয়ারি পাশ করেছে। নাম পরশ। বাবা মা উভয়ে সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন চন্দ্রঘোনায়। মেয়েটা বলে- "আমার নাম চন্দ্রাবতী, ডাক নাম "গুল চুয়ী"। চট্টগ্রাম কলেজে সেকেন্ডে ইয়ারে পড়াশুনা করছি। মা শিক্ষকতা করেন,আর বাবা বেঁচে নেই। গুল চুয়ী নাম বলাতে চন্দ্র কুমারের মন আরো কৌতুহলী হয়ে উঠে-সাথে সাথে জিজ্ঞেস করেন - "আর মায়ের নাম"? চন্দ্রাবতী উত্তর দেয় - "চাঁন্দবি"। চন্দ্র কুমার কিছুক্ষণের জন্য নিঃচুপ হয়ে যায়। মেয়ের পরিচয় পাওয়ার পর চন্দ্র কুমারের মন বিশ-একুশ বৎসরের আগের ঘটনাগুলো একের পর এক স্মৃতিতে ভাসতে থাকে। মেয়েটা বলে বাবাকে দেখিনি। আমার জন্মের আগেই নাকি বাবা মারা গিয়েছিলেন। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে মায়ের

কাছে বাবার নাম বহুবার জানতে চেয়েছিল চন্দ্রাবতী; কিন্তু মা কেন যেন এড়িয়ে যেতেন। সংক্ষেপে জানাতেন বেঁচে নেই। নানা কাজের বাহানা দিয়ে সরে পরতেন, এতে চন্দ্রাবতীর মধ্যে ভীষণ খারাপ লাগতো। ভাবতো- "আমার কি সত্যি সত্যি বাবার পরিচয় নেই?" মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে সে মনে মনে স্থির করে এ বিষয়ে মা থেকে অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবে সে একদিন। কিন্তু অন্য কিছু হলে মা তো অত্যন্ত মনে কষ্ট পাবেন- তাও ভীষণ ভয় হয়!

দুর্ঘটনার পর কিছুটা স্বস্থি এলে চন্দ্রাবতী চন্দ্রকুমারকে কাকা বাবু সম্বোধন করে তাঁর পরিচয় জানতে চায়। অতি সংক্ষেপে চন্দ্রকুমার তার পরিচয় দেয় একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসাবে। থাকেন বান্দরবান শহরে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বিষয়ে কিছুই বললেন না। ইতিমধ্যে চন্দ্রকুমারের ড্রাইভার ও দুই বিয়ারাসহ হাজির হয় ফিরে যাবার জন্য। পরিচয় পর্বে অবশ্য চন্দ্রকুমার বাবু তাঁর ফ্লাক্স থেকে কপি পরিবেশন করেছিলেন তাদের দু'জনকে। এরপর উভয়কে একটা করে ভিজিট কার্ড দিলেন চন্দ্রকুমার বাবু; আর ভবিষ্যতে এলে উনার হোটেল "জিরানী খলা" তে আথিতেয়তা গ্রহণে অনুরোধ করলেন। গাড়ী শহরের দিকে রওনা দিলে চন্দ্রকুমার হাত নেড়ে পরশ ও চন্দ্রাবতী কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আর ভাবতে থাকেন- "আহা নিজের মেয়ে হয়ে আমি বাপের পরিচয় দিতে পারলাম না আজ- আমি কি অভাগা পিতা"! মনটা কলিজার ভিতর থেকে মোচর দিয়ে কেঁদে উঠে হুহু করে। মনে মনে ভাবেন জীবনটাতো এমনিই কাটিয়ে দিলাম কি হবে সয়-সম্পত্তি রেখে। বান্দরবানের "জিরানী খলা" হোটেলের নাম "হোটেল গুল চুয়ী" নাম করণ করে মেয়ে ও হবু জামাইয়ের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য "উইলনামা" করে দিয়ে যাবেন সবার অলক্ষ্যে যা আমার অবর্তমানে তাদের বাকী জীবনে ভোগ করবে। বাড়িতে পৌঁছার পর ড্রাইভার স্যার! স্যার! বলাতে চন্দ্র কুমার স্তম্বিত ফিরে পান আর গাড়ী থেকে নেমে পরেন।

পরিচিতি ঃ লেখক ও সমাজ সেবক
কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।

বিষন্নতা

- বি.এন.তঞ্চঙ্গ্যা

অহনা ভুলে গেছে পাহাড়ের সবুজ বৃক্ষের ছায়ার মতো ভালবাসা। বদ্ধ জলাশয়ে নীল পানিতে প্রশান্তির সাতার, প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে রঙ্গিন ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানোর সময়কাল। তপ্ত গাঙচিল আর উড়ছে না ডানা ছাড়িয়ে নদীর বুক ছুঁয়ে। বসন্তের কোকিলরাও যেন ভুলে গেছে গান। সোহনের একটু নিড়িবিলি হলেই স্মৃতিগুলো অন্তরে উঁকি-ঝুঁকি দেয়। সবারই কি এমনটা ঘটে?

মোহন মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বিএস পাশ করা উনত্রিশ বছরের টগবর্গে যুবক। চিকিৎসার প্রতি প্রবল আগ্রহ তার সেবার প্রতি গভীর অনুরাগ মনে। নিজের পরিবারে রয়েছে পেনশন ভোগী বাবা আর ছোট ভাই বোন। মোহনের কাঁধের উপর। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বোন আর কলেজ পড়ুয়া ছোট ভাই। ঘরে বৃদ্ধ বাবা মা। একা উপার্জনে সকলকেই চালিয়ে যাচ্ছেন। বাবা-মার মুখে হাঁসি ফুটিয়েছেন। এলাকার সবার চোখে তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র। নিজের চেষ্টায় তার প্রতিভা স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। এই যাবতকাল যারাই জীবনের সাফল্য এনেছেন শুধু কষ্টের মধ্যে দিয়েই নিজের স্থান নির্মাণ করেছেন নিজ যোগ্যতা বলে। আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত, সম্মানিত, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাঃ মোহন বাবু।

অনেকদিন পর হঠাৎ অহনাদেবী। চেম্বারে মুখোমুখীতে ভাবিয়ে তুলেছে মোহন বাবুকে। বাড়ীর লাইব্রেরীতে রিভলারিং চেয়ারে হেলান দিয়ে চেনামুখ অহনাদেবীর অতীত স্মৃতিগুলো অন্তরে নাড়া দেয়। ততক্ষণে অহনাদেবীর পরিচয় পেতে শুরু করে। সেই দিনের সেই অনন্ত যৌবনা মেয়েটি। অসাধারণগুণে গুনান্বিত মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলেন তিনি। অহনাদেবীর এমন মোহমবতা ছিল যা দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য কান্ডজ্ঞানহীন করে তুলত। কি এমন আবেদনময়ী ছিল ওর মধ্যে। ওকে স্পর্শ না করে ভালোবাসা ছিল দূরূহ। আর অহনাদেবী বলত স্পর্শ করেই ভালোবাসতে হয়"। যে ভালোবাসা স্পর্শ নাই সেই ভালোবাসার আয়ু কম"। এমন বলিষ্ঠ বাক্য অন্তত কোন মেয়ের পক্ষে বলার সম্ভব নয় এবং শুনেননি মোহন বাবু। নিজের কষ্ট আর যন্ত্রণা সব উৎসর্গ করে প্রেম নিবেদন করেছিলেন মোহন বাবু। কিছুই গোপন করেননি তিনি। তার পারিবারিক অবস্থা এবং ছোট খাটো ভাল মন্দ। এখন বলা যায় অহনা ওর সরলতা, সততার মর্যাদা রাখতে পারেনি। কিভাবে রাখতে হয় অহনাদেবী শেখেনি। অথচ একজন সাহিত্যমনা অহনা কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে আজও ভেবে পান না মোহন বাবু। যখন ওদের প্রেম নিয়ে পাড়াময় উম্মাদনা বিরাজ করছে। তখনও তিনি বীরত্বের

সাথে শক্ত হাতে প্রেমের হাল ধরেছিলেন। শুধু মাত্র উপরে উঠার সিঁড়ির জন্য মোহন বাবু অহনাদেবীকে তার প্রেমের মুকুট পড়িয়ে দিতে পারেননি। তাই বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে গেল। আজও মোহন বাবুর বোধের অগম্যই রয়ে গেছে।

অহনাদেবীকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেন মোহন বাবু। শত সহস্র প্রশ্ন মাথার কোষে কোষে ভিড় করছে। সামনে টেবিলে রাখা বেনসন সিগারেট প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বন্ধ করে টান দেন আর ভাবেন। আজ এই সময়ে শত রকম প্রশ্নবানে জর্জরিত মোহন বাবু। অহনাদেবী মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষেরা কি স্বভাবগত আচরণ যে, নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য উন্মুখ থাকে? নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যোগ্যতাকে এক সময় অকৃপণভাবে জাহির করার অনায়াসভঙ্গি কি চিরগুণ? সততা, সরলতা, নির্ভরতা, প্রেম ভালোবাসা, বিশ্বাস এর কি কোন মূল্যই নেই। না-না-অবশ্যই আছে। যুগ যুগ ধরে আছে এবং ছিল। তবে কিন্তু এর মর্যাদা সবাই বহন করেনা। যেমন করেনি অহনাদেবী। অহনা দেবীর হৃদয় স্বাশ্বত নয়। মোহনের গভীর বিশ্বাসকে একটুও নাড়া দেয়নি অহনার হৃদয়ে। অথচ কি অবলীলায় অন্তরের গভীরে অর্গল খুলে দিয়েছিলেন মোহন বাবু। পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, নির্ভরশীলতা, বিশ্বাস এর কোন কি মূল্যই নেই অহনার? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখেন রাত দুইটা ত্রিশ মিনিট। কেন জানি আজ অহনাদেবীর কথা গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে? মোহন বাবু নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করেন। কেউ কি বিশেষ কারো হয়? অহনাই কি পুরিপূর্ণভাবে মোহনের হয়েছিল? মানুষের মন বড় বিচিত্র। মনের হদিস পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। অহনাদেবীর সাথে সম্পর্ক ধ্বংস নামার পর পরই মোহন বাবু সতর্ক হয়ে চলেন। মোহন বাবু এখন অন্য রকম মানুষ। সদা হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তিময় পুরুষটি আজকাল কারও সঙ্গে অন্তরঙ্গ হন না। হতেও চান না। জীবনে দীর্ঘ সময় পাড়ি দিয়ে একটি কথায় যত্নে লালন করেছেন, অন্তরে নিভৃত্বে কারও বিশ্বাস ভঙ্গতা চুরি-ডাকাতির চেয়েও বড় অপরাধ। আর্থিক বিশ্বাস ভঙ্গতার চেয়েও মানসিক বিশ্বাসহীন তার আঘাতও অনেক বড়। যারাই জীবনে বিশ্বাস ক্ষত হয়েছেন তারাই একমাত্র জানেন। বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে মোহন বাবুর।

পরিচিতি ঃ সমাজ সেবক, কাঁঠালতলী, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

কাপ্তাই বাঁধ অবলম্বনে- ছোটগল্প

ঝুলবারান্দা

- চাইথোয়াই অং মারমা (অন্তিম)

লেকের পানি থেমে আছে। বাতাস বইছে না কোথাও এক ফোটা। মাঝ বয়সী রুংলা প্রায়শ মাঝ রাতে না ঘুমিয়ে পাড়ে এসে দাঁড়ায়। ঘুমকে জীবনের বোঝা মনে করে সে। ঘর ছেড়ে আজও তাই পানির কাছে এসে দাড়িয়েছে। জল আর জোছনার মাখামাখি দেখলে তার মনটা কেমন যেন হয়ে ওঠে। সায় দিয়ে যেতে পারে না। তবুও দেখে। ঠিক যেন অভিনেতা বাবার খোলা চুমু দৃশ্য দর্শক ছেলে পর্দায় দেখছে। অব্যক্ত সঙ্কোচবোধ ভিতরটাকে আরো সঙ্কোচিত করে তোলে তখন। কৈশোরটা তার এমন ছিলনা। যখন জোছনা বুঝেনি তখনো চাঁদ ফুটলে মেতেছে। দুই হাত তুলে নেচেছে। মন ভরে গায়ে মেখেছে কত। সত্যতে রুংলার শৈশব ছিল রূপালী আভার মিশ্রণ। ষোলো আনা জীবনের এক আনা বয়সী কথা।

মংলা স্কুলে যায়। যায় কি; তিন বছর ধরে ক্লাস থ্রীতে পড়ছে। তার মায়ের অভিযোগ- পরীক্ষা শেষে শিক্ষকরা কি যেন চারু-কারুর নামে ঝান্ডা-ঝাড়ু নিতে বলে। ওটা নেয়া হয় না বলে বড় ক্লাসেও ওঠা হয় না আর। ছেলের যোগ্যতা আছে, আপনাতে সব জানবে শিখবে তবুও ঘুষ দিয়ে বড় ক্লাসে চড়াবেনা এটাই জোর কথা। প্রতিদিনকার বিকেলের মত আজো মাচাঙের ঝুলবারান্দায় বসে দুই জায়ের গল্প চলছে।

-ছেলে স্কুলে গিয়েতো এখন মোটামুটি..

বলতে গিয়ে থেমে যায়। এক নিঃশ্বাসের পর আবার-

-সে কি দুই একটা বইরে রুংলা'মা? পাহাড়, পাহাড়! নিজেওতো দেখো। তোর কাকিরে একটা ছড়া শুনাতো বাবা।

-মংলা ঘাড় নাড়াল।

ময়নারে ময়না কোথা যাস?
বিলের ধারে কাটব ঘাস,
ঘাস কি হবে?
বেচব হাঁটে
কিনব শাড়ি পাটে পাটে,
বোনকে দেব পাটের শাড়ি
মাকে দেব রঙিন হাড়ি।

এইতো, এইতো, বাক্যে সন্তানের আরেকবার প্রসংশা করে বলে;

-বাবা, রুংলাকেও একটু ইংরাজি বলে শুনাতো।

-জাহাজ মানে ship বাড়ি হল home আরো mat, cow, dog...

আচছা বলতো রুংলা ইঁদুরকে কি বলে?

রুংলা সঙ্কোচে মুখ লাল করে একটু নড়ে বসল। কিছু বলল না। ময়না দিয়ে তৈরি যে কোন ছড়া রুংলা খুব ভালবাসে। সবার সামনে ভয়ও পায় আবার। উতলা হয়ে লুকিয়ে একবার ঝুলবারান্দার পিছনে চোখ বুলিয়ে নেয়। সন্তানের শরীরি ভাষা স্বল্পভাষী মা হয়তো বুঝে। কারো না বুঝার মধ্যেই রুংলার স্বস্তি, তাই হয়তো আবার মা বুঝেনা।

রুংলা স্কুলে যায় না। মা বলেছে বড় হলে পাঠাবে। বড় সে আর কত; মা ছাড়াতো কেহ জানবে না। স্কুলে ছেলেপুলেরা লাফালাফি করে। নাচানাচি করে। কোথাও এক মূহুর্ত স্থির থাকে না। মশকরা করেও কেহ যদি ছেলের চোখে কলম দিয়ে খোঁচা মারে। এই যদির ভয়ে ছোট রুংলাকে আর স্কুলে পাঠায়নি।

সূর্য রাঙা এক সকালের কথা। ১০ বছরের রুংলা তার জ্যাঠাত ভাই মংলার সাথে বসে আছে। উঠানের নাতিদূরে গামারী গাছের শীল জমানো গুড়ির উপর তারা দুইজন। মুলি বাঁশের ফালি করা অংশ দিয়ে ধনুক বানানো হয়েছে। এখন তীরের ডগায় কাটা যুক্ত করছে। তীর বানাতে যথেষ্ট কাটা আছে। দুই দিন আগেও একটা সজার" শিকার হয়েছিল। রাতের অন্ধকার ভেবে প্রাণিটা মাটি খুঁড়ে শিমুল আলু খেতে আসছিল। চাঁদের ক্ষীণ আলোতে যতটা না দেখা যাচ্ছিল তার চেয়ে বেশি লেজে থাকা ঘন্টির আওয়াজ টার্গেট নির্ধারণে সহযোগিতা দিয়েছে। সেদিন মংলা তীরবিদ্ধ করতে না করতেই রুংলা দৌড়ে এসে কলা গাছের গুড়িতে ধপাস শব্দে বসিয়ে দিয়েছিল পিঠে।

সারিবদ্ধ পিঁপড়ার দল নতুন ঠিকানায় যাচ্ছে। বড় মাথাওয়ালা সেনাপতি সবার সামনে। রাজ্যসুদ্ধ খালি করে চলেছে যেন। অনেকটা ৮১ সনে মাটিরাঙ্গাবাসীদের ইন্ডিয়া গমনের চিত্র। মাথায় টুকড়ি। টুকড়িতে মাচাঙ হতে তুলে আনা লাউ। কারো মাথায় মুরগি। কারো কোলে ঘুমন্ত সন্তান, কারোবা আবার প্রিয় পোষা মিনি। পিঁপড়েদের পোষা প্রাণি আছে কিনা কে জানে। তবে ভারবাহী পিঁপড়ার দল দেখে মনে হয় তাদের রাজ্যেও সব আছে। শুধু রাজ্য হতে সব আনা হয়েছে কিনা সেটা কেউ জানবে না। হঠাৎ রুংলার বসা গাছের গুড়িতে বাঁধা পেয়ে কিছুটা এলোমেলো হয় দল। এমনিতে পথে বাঁধা তারোপর হতচ্ছাড়া ইঁদুরটা দৌড়ে এসে চলার পথে দাগ কেটে দিল। কার উপর কে গেল, কে রাখে কার খবর। রুংলা রুংলা করে হঠাৎ নিচের সরষেতে থেকে মংলার ডাক এল। দৌড়ে গিয়ে যা দেখল তা পুরোটাই স্বপ্নকে হারমানায়। হাঁটু নিচু পানিতে ডুবে গাছগুলোর উপরে একাংশ বাতাসের সংস্পর্শ পেয়ে দুল খেয়ে চলেছে। সরষের ঝরা ফুলগুলো মৃদু ঢেউয়ে পড়ে নাচানাচি করছে। চারদিকে হলুদের সমারোহ রুংলার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য জীবনটাতে আর একবার দেখা হয়নি দু'চোখ মেলে। ওপাড়ার ছেলেপুলেরা পানিতে পড়ে লাফাচ্ছে। বৃষ্টি বাদল ছাড়া এমন নতুন পানি কার মনে না আনন্দ তোলে। উপরে দেখে আসা সারিবদ্ধ শরণার্থীদের স্বজনেরা এখানে বৃত্তাকার কুন্ডুলি পাকিয়ে ভাসছে। অজানা অনিশ্চয়তায় জীবনগুলো ভাসছে আর একটু একটু করে উপরে উঠছে।

পরিচিতি ঃ ছাত্র, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ।

মিসুলুক

-চন্দ্রসেন তন্‌চংগ্যা

জুমর পাআনা ধান এসঙ' কাবা ন অয়। সাত্তামুলা পরে আদাম' ক্যঙত কঠিন চীবর দান। চীবর দান মেলাত দুরত বামত্তুন গর্রয়া আবাক। ই সাত্তাবা ভিদিরে কামুন চিবায় ন পাইল্যে মেলা দুলে খা নুব। ধুবিটুবি কাম গরের মেলাক্কো-মা। মেলাক্কো বঅরে কামত ফাগ ন পায়। আলসি মাধা খায্যা। মেলা মাইঞ্ছে গায় গায় কুদ্দুর ফরে আসে য়ায়। ডরায় ডরায় জুমত যায়, এয়ালা খিসি কাম গরে। আথ মেলাক্কো বঅরে বড় কধা ন কয়, অভিশারাপ ন দে। তে বুশে, নেগ উলদে আমন' ঘর' ভগবান। ভগবান' উবুরে বেচার উবার নায়। বেচার অনায়' গম নয়।

তিন্নয়া ঝিপুদত্তুন মেলাক্কো ছ'বছর। ডাঁ মরত্তয়া তিন বছর, চিয়ন্নয়া ছ'মাইচ্ছ্যা দুধ' পআ। জুমত গেলে তারানেয়' গনে গনে নিচায় মেলাক্কো-মা। পআ-সআউন গারেঙত থান, তে কাম গরে। সাঝুন্যা মাদানত ফিরন আদামত। সিদিনা কামত্তুন আলে তনাক্কো যাইনে জুইত জুইত গুরি কয়, বেভে দে, আদাম্যাউন কয়াকুয়ি গুইত্তন য়া, মিসুলুক বেলে নিক্যন।

পরানান চিয়ুত গুরি উদে মেলাক্কো-মাত্তুন। আইচ্যা বেলে তিবিরাছুড়িত এক্কআ ধুইজ্যন, তনাক্কো কয়।

গঙদত মেলাক্কো মা মুঅত্তুন নীরি আসে, চিন্যন্দে সিবা?

- না দে।

- আ কেনে ধুরি পায়্যন? কবাল' চামান এম্মুরুক থবাতুচ্যা গুরি পুছার গরে মেলাক্কো মা।

- য়াবা। বিলত বেলে এজ্ঝাক পআ খেলা খিত্তন নি, সিদি বেলে এক্কয়া অচিনা মরত গিয়ে। তাত্তুন এক্কয়া বক্কায়' আহে। বক্কাবা ভিদিরে কি দুড়ি, ব্লেড, পিঢা আ কি কি বেলে আহন। পআউনরে বেলে পিঢা দিয়ে। আ চিয়ন পআ, পিঢা পালে তারাত্তুন কি পরানে মাএ য়ায়। কয়দে বেলে, তুমি আর' পিঢা খায় পাবা। কন্না মেরে ধামিয়াদ' পথান সুইত পায় দি পারিব? যে পারিব, তারে মুই আর' বড় বড় পিঢা খাবাইন। হেনে কা' পআ এক্কয়া বেলে তা পুনে পুনে যার। ধামিয়াদ' পথান সুইত গুরি দেয়া। বুদ্ধি ভাষা উয়্যা এক্কয়া পআ আমর গুরি পারি দুমুরি যাইনে আদামত খবর দিয়েহোই। আদাম্যাউন যাইনে লড়াই লুড়ুই বেলে ধুরি পায়্যন। পুছার গুইল্যে বেলে ন কয়। কোয়েক্কয়া যেক্কে দুরুম দারাম পিঢত ফেলায় দিয়্যন, তেহ্ বেলে মু খুলে। কাইঞ্চা গাঁঅত কুধি এক্কান বড় পুল বেলে দিদন নি, সিদি ছ'কুড়ি মানৈত বেলে ভুগ দেয়া পড়ের। বান্দরবান, খাঁড়াছুড়িত বেলে গদা ছিচ্ছন। দেত-মুরুক থলমল গুরি তারায় মানৈত ধুরি নিচায় নিচায় ভুগ দিদন্দে।

মিসুলুক কুলে মেলাক্কো-মা যম ডরায়। চিয়ন' লক্কেনে পিসাঙা-ঝি বৈন চিয়ন মালাল্লোই একসমারে গরু চরাইদ। একদিনা গরু চরাইদে চরাইদে আধিক্ক্যা গুরি দ্বিবা বড় বড় মানৈত আয় তা মুসুঙেত্তুন চিয়ন মালারে ধুরি নিয়ন্দে। তে ছিদি উড়ায় ধায়নে বাঁইচ্যে। আদাম্ম্যাউনে তআয়নেয়' চিয়ন মালারে তআয় ন পান। পরেত্তিন শুনেদে সিয়ুন বেলে মিসুলুক। সিত্তুন ধুরি মিসুলুক কুলে তাত্তুন জারপাদা জাঁৎজাঁৎ গুরি উদে। চিৎ কুইল্যা শাল্লয়া ওই যায়। তা ধাক-পাশারাত লুয়ি আহঞ্জিদে ধক্ক্যা লায়ে। মেলাক্কো বাবে কুধি গেল কি জানি। এম্বা অকাল কিরিং গরের, তে আহেদে ফাত্তয়া বেড়ায় বেড়ায়। সাত্তাবা গঙাল। এসঙ দেহাশুন্দা নাই। আ কুধি ফেয়ক ওই থায়োয় সিবায়? মনে মনে ভাবে মেলাক্কো-মা।

- আইচ্যা কার্বাজ্যা ঘরত তিম্মাং আহে য়া। বোনোই আলে ভাত খায়দায় যাবার কোইত।

মেলাক্কো মা ভাবে, ভারি চিত শাল্লয়া মিসুলুক। কি সৎবৎ নায়া! দয়ামায়া নায়া! জেদা জেদা মানৈত এক্কয়ারে কেনে কাবিনে পুচা দি পারন? সেদক টেঞ্জা পরানে মায়িলে নিজ' পআবা ভুগ দিনে টেঞ্জা কামায় ন পারন নে? পর' কড় খালি গুরি দেনা?

তা তবনা থুম ন অয়। মেলাক্কো বাবে ফেচর মেচর গুরি ঘরত লুঙেসি। তে আগে মাডি উদে, ঘরত ব্যাক্কুন সুখ আহদে?

- ঞ্জি। কুধি গিয়ইত্তে তুই?

- মর কি? ফাত্তয়া বেড়ানায়।

- দেত-মুরুগ' খবর শুন্যইত? ফারাদশা লুঙেসি। মিসুলুক বেলে নিক্ক্যন য়া। আদাম দিয়ালি রাইত ভাঞ্জি চুয়ি দিবাক নে কি গুরিবাক, সিয়ান লোইনে কার্বাজ্যা সিদি তিম্মাং আহে বিলি কোই গিয়ন। যিদি পায় ন যাইত, মুই মিসুলুক ডরাংয়া।

- চিদা ন গুরিত, মুই আহং। তমার কিচ্ছু উইদ নয়।

সিদিনা আদাম্যা ব্যাক মুরুব্বি, মতায়ন, কুইচ্যা মাংগৈন, গাভুজ্যা দভা বোইনে সল্লাবিসানা গুইল্লাক। মেলাক্কো বাবেয়' গিয়ে। পুত্তিদিন দিনত চাইজ্জন, রাইদত দইজ্জন পালা গুরি আদাম চুয়ি দিবার উহুম পোল।

মেলাক্কো মা আর ঝি-পুত্তুন ন নিচায়। কামত গেলে গায় গায় যায়। ঝি-পুত্তুন ফেলায় যায় আদামত এজ্জন' ঘরত। মেলাক্কো বাবর খরচে ঝেলেমেলে গুরি চীবর দান গঙায় যায়। মেলাক্কো মা আমগ অয়, ইদুক্খান টেঞ্জা তুই কুত্তুন পালে? চুর-ডাকাইত গুজ্যইত নেহি?

মেলাক্কো বাবে হাসি হাসি কয়, মরে চালে সেনেক্ক্যা লায়ে নেহি? চুর' ধক, ডাকাইচ' ধক?

- ন লায়ে। কাম নায়, করইদ নায় ইদুক্খান টেঞ্জা কুত্তুন পায়ইত পুছার ন গুরিন না?

- রোয়াজা হাদত এক্কয়া বাঙাল্লোই ফাগে বেয়ার ধুইজ্যংগে। এই ধর শাক-পাত,

কুঁয়্যা-কলা সেনেক্ক্যা কাচা মাল' বেয়ার। মুই কাম গুরি ন পারং বিলি কি বেয়ারক্ক গুরি ন পারিন না?

- ও! মেলাক্কো বঅ কধা শুনি মেলাক্কো মা মনত এক্কেনা বোয়ত পায়। কয়, অপধত ন যাইত। সুএ ওক, দুএ ওক মুই কাম গুরিনে উলেয়' সংসারান চালাইন। মাইঞ্চে য়েনেয়' কন য়া, ম নেক্কয়া আলসি বিরিজ্যা ফাত্তয়া। শুনি থাবার আহে, মুই বানা শুনি থাংগে। মুই ন চাং মাইঞ্চে সিয়ান বাড়ায় কুইদোক, ত নেক্কয়া চুর, ত নেক্কয়া ডাকাইত...

- আহ্! সিদ্দুর কি চিন্দা গরইত? মাইঞ্চে চুখ পেচাইদোক। তুই মুই ঠিক থালে উয়্যে। কাম-করইদ চিবায় আসে। সাত্তাবা পরে মেলাক্কো বাবে আর' রোয়াঙ অয়। মেলাক্কো-মা থায় চিদায় চিদায়, ডরায় ডরায়। সাত্তা ক্য অয়। মেলাক্কো বাবর পাত্তা নায়।

দ্বিদিন আগে আদামত এক্কয়া মিসুলুক লড়ায়ন। নিশি রাইদত কান্দুরিদায় ঘর' দঙারান বেলে খুলেত্তে তারায় স্কাইত পায়্যন। তারায় 'মিসুলুক মিসুলুক' বিলি কিচাক কাড়ি উদিলে আদাম্যাউন ঝাবায় পুজ্যঞ্জি। তারায় হোইহাই গুরি আইদে আইদে মিসুলুক্কয়া ধায়্যে। হ্রে বায় মুরাত উচ্যে হোই। পুনে পুনে ভালুক দুর লড়ায়ন্দে, লাক ন পান। সিত্তুন ধুরি আদাম্যাউন আর' চুখ-কান সদাক উয়্যন। মিসুলুক্কয়া যুনি নিজ' লুক কুদুম' অয়, তারে ধুরি পালে জেদা জেদা গারায় দিবাল্লায় তিস্মাং ভাঞ্জিলাক।

মেলাক্কো-মা পরানান ইত্তুক অয়। মনবল চিমায় আসে। পাদা এক্কান সরাৎ গুইল্যেয়' উবুরি উদে। মনে মনে নিজ' কবালানরে দৈত দে। কি চিত শাল্লয়া নেগ পালুং ইবা। ভগবানে মেরে ইত্তুন বাড়া পোই পারি দিবার ন পায়দে য়ায়! মাইঞ্চ নেক্কুন চালে এদ্ধক, আমন' নেক্কয়া চালে এদ্ধক। তাঅলান' ন ধরে। ইন্দি গেলেয়' আমনে, উন্দি গেলেয়' আমনে। ভগবানত্তুন বর মায়ি ন জানংগে নয় নে? আর' বউত বউত কধা। ভাবিদে ভাবিদে চুঅ পানি তেদে-তাদা পড়ে কদবালা। হাক্কন থায় শুয়ায় যায়।

আদি-আদাক গুরি নানান কাইত্তিত্তুন নানান কধা শুনা যার। ইন্দি উলেয়' মিসুলুক লড়াইদন, উন্দি উলেয়' লড়াইদন। ধাগে পাশারায় কন' আদামত শান্তি নায়। ব্যাক্কুনে উবুদা। ইক্কিনা মিসুলুক্কুন দল ভিরি বেড়াইদন বিলি শুনা যার। একদলত চার পাঁইজ্জন। আগে-দ বানা চিয়ন পঅা ধুরি নিদন্দে, ইক্কিনা বেলে ডাঁঅর মানৈদ' গায় গায় পালে ধুরি নিদন। কন কন আদামত বেলে সেনেক্ক্যা লড়াং খায়্যন।

থাক্কে থাক্কে দ্বি সাত্তা পার ওই গেল। উদুন্দুমা তনাক্কো আয়নে মেলাক্কো-মা কানে কানে কয়সি, বেভে! বোনোই বেলে মিসুলুক উয়েদে শুন্যইত্তে নে?

তনাক্কো কধান শুনি তা মাধা ঝিং গুরি উদে। কাঞ্জাবা গরম অয়। চুখ-মু আন্থার ওই পড়েসি। কিয়ে টদা চিবি ধুজ্যন্দে ধক্ক্যা লায়ে। রঅ মিলি ন পারে। হ্যা-না সং ঝিম্মারি বোই থাইনে পুছার গরে, কাত্তুন শুন্যইত্তে?

- কন আদামত বেলে চাইজ্জুন্যা এক্কয়া দলত তারে দেহা গিয়ে বিলি খবর আইচ্ছে। লড়ায়ন বেলে ধুরি ন পান। আদাম্ম্যাউন ইক্কিনা খাপ দি আহন। বোনোই আলে ধুরিবাক। কি জানি বেভে, তমা আমা কবালত কি আহে! একমাত্র ভগবানে জানে। বোনোই আলে আদামত খবর পাঢাবার কুয়্যন য়া। দুলে থাইত বেভে।

তনাক্কো গেলেয়' তারে আর কিচ্ছু পুছার গুরি ন পারে মেলাক্কো-মা। তার জ্ঞান-বুদ্ধি মিলায় গিয়ে। যি নেক্কয়ারে তে ভগবান' ধক্ক্যা পুজে, তে সেনেক্ক্যা চিৎনায়া ওই ন পারে। তে আলসি বুশিল, ফাত্তয়া মানিল- তনাক্কো কধান যুনি সুত্য ওই থায় তে কি গুরিব? কারত্তুন পুত্থি ন পায়। ইসাবে কুলায় ন পারে। পরানান বিবিরায়। হ্াত-টেঙ জুরায় আসে।

সিদিনা নিশি রাইদত মেলাক্কো বাবে ডায়েসি, মেলাক্কো-মা, মেলাক্কো-মা।

মেলাক্কো-মা তারে চিনি পারে। পরানত ডর ফুদে, তে কি মিসুলুক ওইনে আইচ্ছে, নেহ্ মুগ' মায়ায়, পআ কিবায় আইচ্ছে? মেরে ন কাবিব দ? ম পআ-সআউন ন নিব দ? না, তে সেনেক্ক্যা ওই ন পারে। চুইদ্দ খারাপ উলেয়' নিজ' ঘর' মানৈচ্ছুন' উবুরে কেনে অসক্কার গুরিব?

মেলাক্কো বাবে আর' ডায়ে, মেলাক্কো-মা, ডঁআরান খুলি দেসি দে।

মেলাক্কো-মা ডঁআরান খুলি দে। মেলাক্কো বাবে ঘর' ভিদিরে শুমিলেসি মেলাক্কো-মা তারে আসা গুরি ধুরি কানি উদে। বানা 'মেলাক্কো বাওপ' কোই পারেদে, আর কন' কধা তা মুঅত্তুন ন নীরে। কি কুব, কি পুছার গুরিব তার জ্ঞানে ন ধরে।

মেলাক্কো বাবে তিতি ক্ষম। কয়, ঘরত ব্যাক্কুনে সুখ আহদে?

- দিন মাদানান যা শুনির, তুই কহ্ আমি সুএ থায় পারির নেহি? তুয়' ঘরত নায়। তরে নিচায় নানান কধা শুনঙর। মুই মেলা মানৈত। কারে কি কুইদুং? কারে কেনে বুশাইদুং? মাইঞ্জে তরে খাপ দি আহন। ধএ পালে ধাসায় ফেলাবাক। ম কবালত সুখ আহে নেহ্ দুখ আহেদে দা? আর' কোইদিন এনেক্ক্যা অকুলত থায় পাইন্দে মুই? কোই কোই মেলাক্কো মা গুচুরি কানি উদিবার মাএ। গুচুরি কানি উদি ন পারে। ধাএ পাশারায় কি জানি কিয়ে শুনিলাক নেহি? ঘনঘন বারিত্তিন ঘর' চাইকাইচ্যা রিনি চায়। মেলাক্কো বাবেয়' ভীবা গরে।

রঅবা চিয়ন চিয়ন গুরি তরাতুজ্যা কয়, মেলাক্কো-মা, ইক্কিনা লাম্বা লাম্বা লেকচার মাডিবার হেন নয়। তরে মুই ইক্কিনা কন' জবাব দি ন পারিন। দিন মাদানান এক্কেনা হুঁীং ওক। ম হ্াদত সময় কম, মুই দিরি গুরি ন পারঙর। সদাগে থাক্ক্য। মুই যাঙর।

মেলাক্কো-মা'রে কন' কধা কুবার জু ন দি ফুড়-ৎ গুরি নীরি যায়গে মেলাক্কো বায়। মেলাক্কো-মা পরানান আর' চিয়ুত গুরি উদে, সালেন তে যিয়ান আদি-আদাক গুরি শুন্যে সিয়ান মিছা নয়। আদাম্ম্যাউন তারে খাপ দি আহন। ক্ষাইত পালে জেদা জেদা গোরত দিবাক। ভালা ওক মন্দ ওক, নিজ' বুঅ নেগ। নিজ' পরানান যায় পারে

তহ্ নেক্কয়া আইচ্ছে বিলি আদাম্ম্যাউনরে খবর দি পাইত্ত নয়।
পআউন' কাইচ্ছ্যা রিনি চায়। তারায় আসাআসি গুরি ঘুঞ্জাইদন। তারা বাবে যে আইনে গিয়েহৈ, সিয়ান তারায় ক্ষাইত ন পালাক। দ্বি গালত চুঅ পানি বায় পড়েসি মেলাক্কো-মা'র। অন্তরান জ্বলে। কি আশায় মেলাক্কো বায় অপধত গেল, তা মাধায় ন হেলে। কেনেসে ই অভিশাবত্তুন ছাড়ান পাব, সিয়ান' মাধাত ন ধরে। দ্বি চুঅ পাদাত্তুন আর এক উবার আঐত নায়। পেড' আদুরি চিমায় গিয়ে। রাইত্তয়া গঙালেয়' ঘুম ন আসে, দিন্নয়া কাদালেয়' পেট ন পুড়ে। মুঅত-ঠুঁদত হাসিনায়া রুচিনায়া গুরি ভালুকদিন কাদাল তে। দিন যেদক গঙায় যার, দেত-মুরুগ' খবরান সেদক ভালা ন আসের। পধে-ঘাদে আদি-আদাক গুরি মাইঞ্জে কুইদন, মেলাক্কো বঅর দিন বেলে ফুরায় আইচ্ছে। এদকদিন বেলে সময় মাক্কে, এসঙ' পআ নিচায় দি ন পারে। সন্দাজ্যা বেলে রাগে জ্বলের। এদক দিন' ভিদিরে পআ নিচায় দি ন পাইল্যে বেলে তা জীবনান দেয়া পুড়িব। সেনে তে বেলে ইক্কিনা কেনা কিদিক্ক্যা গরের য়া। ভাইলগ, বৈনলগ এক্কেনা সদাগে থাক্য। কোই ন পারে, সবায় ন পাইদে নিজ' আদামত্তুন' দি পারে। চিত শাল্লয়া মাইঞ্জুর কমলে লুক কুদুম?

কিয়ে কিয়ে কন, চিত শাল্লয়াত্তুন কমলে? ধএ নুলে নিজ' পআউন' ন দিবদে কি বিচ্ছাইত?

মেলাক্কো-মা বানা মাইঞ্জু কধা শুনে, ফিরায় দি ন পারে। আর কিচ্ছু ভাবিবার আঐত তার নায়। কাররে কিচ্ছু কুবারক্ক নায়। তে ইক্কিনা থাইন মরা। বানা ভগবানরে সুরন গরে, তা নেক্কয়া যাথে গমেদালে ফেরত আসে তা বুঅত।

চিন্দায় চিন্দায় ধল পহ্র ফুদিবার জআয়। তেহ্ না তে ঘুম যায়। কাঞ্চাবা কুরিত বত্তাঅল এক্খান ধারায় থয় তাক্খামে। কআ ন যায় কমলে কি অয়। ছিড়া ঘরত কিয়ে অসংকার গুইল্যে মানৈত ডায়িদে ডায়িদে ভালক্ষণ।

সিদিনা নিশি ঘুমে চাবি ধুজ্যে তারে। কন্না এক্কয়া তা বুঅ পআবা টানি নিচাত্তে ধক্ক্যা পালে ঘুম ভাঞে তার। আন্থারে মান্থারে ঠা'র গরেদে কালা জুম্বুর কিয়ে তা বুঅ পআবা যদেপদে টানি নিচাল্লে। ধাএত্তিন বিচিরায় চায়, মেলাক্কো ঘুম যার। আইজ্যা পআবা নায়। সিবারে আগে কুধি বোই থুয়্যে হোই পারাপাং! ইক্কিনা বুঅ পআবা খঁআয় নিচাত্তে!

ঘর' দঁআরান ধুরিবার আগেত্তিন সদত কাঞ্চাবা কুরে থুয়্যা ধাত্তাঅলান লোই ঝাম্মারি পুলহোই মেলাক্কো-মা। সৎবদ নায়া গুরি কিচাগত গত্তানা বেড়ায় দিল এক কুপ। রণত হার মানিল কালা জুম্বুর্রয়া। এক কুবে তা শিরাবা ছিনি পুড়ি মাদিত গুরহার। সলা মারি তা হ্াদত্তুন পআবা কাড়ি লুল মেলাক্কো-মা। রণে বেওইত ওই ধাসায় পুড়িল তেয়'।

কিচাক শুনি আদাম্ম্যাউন ছিদি উড়ায় আসন। দেহন্দে পআবা বুঅত গুরি মেলাক্কো-মা বেওইত। সাঁউ পুইদাত রাঙা লো নাল বোই যার। মেলাক্কো বায় দ্বি কত্তা। মানৈচ্ছুন কয়াকয়ি গরন, "তারে পাবে লড়খায়েদে।" নিজ' মুগ' হ্যদত মরা পুইল্য তার। নিজরে ভুগ দিনে ফুরায় দিল তা আলসি মাধা খায়্যা মিসুলুক্ক্যা সংসার। মেলাক্কো-মায়' রাহাল তা মানিক্খুন, তা মুসুঙর আমানত্তুন।

যি মানৈচ্ছয়া লো ডরায়, যি মানৈচ্চয়া ভাবে কি সদ্‌বদ নায়া মানৈত- জেদা জেদা এক্কয়া মাইঙ্গুরে কেনে কাবি পারে? সি মাইঙ্গে সদত কাবিল নিজ' নেক্কয়ারে, সদ্‌বদ নায়া মিসুলুক্যারে। এক কুল রাহাইদ যায় ভাঙিল তার আর' এককুল। ওইত জ্ঞান ফিরিলে কি উব তার? পেয়্য গুরিব না গুচুরি কানিব? সিয়ান একমাত্র ভগবানে জানে।

পরিচিতি ঃ লেখক, পাত্তুরু তুরু (২০১৪)।
ই-মেইল ঃ chandrasen2014@gmail.com

মানুষ দেবতা

পণ্ডিত শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র তনচংগ্যা

সংগ্রহে - কর্মধন তনচংগ্যা

(তৃতীয় অঙ্ক)

(প্রথম দৃশ্য)

স্থান = মচল গ্রাম

(মঘবা-সুদাম-শীলানন্দ-সত্যান্দ বাসিকুঠার হাতে প্রবেশ)

মঘবা ঃ গ্রামের পূর্ব পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ এই চারি দিকের রাস্তা নতুনভাবে খুব প্রশস্ত করে তৈরি করা হয়েছে। আর অসমান রাস্তা সমান করে দেওয়া হয়েছে।

শীলানন্দ ঃ যেখানে নালা-নর্দ্দমা রয়েছে সেখানে ভাল করে পুল দেওয়া হয়েছে।

সত্যানন্দ ঃ রাস্তার চৌমাথায় জলছত্র তৈরি করা হয়েছে- পথিকগণ জলের তৃষ্ণা দূর করতে পারবেন।

মঘবা ঃ আমরা চারি দিকে নতুনভাবে রাস্তা তৈরি করে দিয়ে- পথিকগণের চলা ফেরার খুব সুবিধা করে দিয়েছি। পথের চৌমাথায়-পান্থশালাও জলছত্র তৈরি করে পথিকগণের মঙ্গল সাধন করছি। এই হচ্ছে জনগণের সেবা করা বড় ধর্ম।

সুদাস ঃ পথিকগণে, দিনরাত চলাফেরা করতে কোন অসুবিধা হবে না।

শীলানন্দ ঃ জনগণের উপকার সাধন করাতো আমাদের প্রধান কর্তব্য পালন।

মঘবা ঃ ভাইসব! আজ আমরা যেই মহান ব্রতে ব্রতী হয়েছি। সত্যই আমরা আজ স্বর্গ পথের যাত্রী।

(গীত কণ্ঠে ধর্মানন্দ প্রবেশ)

ওরে স্বর্গ পথের যাত্রী তোরা- মানুষ দেবতা। জনহিত কাজ করে
যাও- সবে মিলে হয়ে একতা।
জন সেবা বড় ধর্ম,
মানুষের কর্তব্য কর্ম,
বুঝতে যদি এর মর্ম
মানুষের মঙ্গল হয় যথা। ঐ

মঘবা ঃ ভাইসব! আমরা আজ সত্যিই স্বর্গ পথের যাত্রী। পঞ্চশীল পালন করা আর সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করা এবং জনগণের সেবা করে যাওয়া আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত। ইহা হবে আমাদের যাত্রা। পথের প্রধান সহায় সম্বল পাথেয় স্বরূপ। আজ আমরা এই কাজে সত্যিই আনন্দিত।

সুদাম ঃ এইভাবে জনগণের সেবা করে এই ক্ষণ ভঙ্গুর মানব জীবন সার্থক করে তুলবো।

মঘবা ঃ ভাইসব! বেলা অনেক হলো যেখানে এমন ও কাজ সম্পূর্ণ হয়নি- তা কাল আবার এসে সবাই মিলে করে যাবো, চল- আজ। (যাইতে উদ্যত)

(এমন সময় দুইজন-রাজ ভৃত্য প্রবেশ)

১ম ভৃত্য ঃ ঐ-যে বেটারা পালাচ্ছে।

২য় ভৃত্য ঃ শিগ্‌গির ধরে বেঁধে ফেল।

মঘবা ঃ আরে বাপু! আমরা তো কারো অন্যায় করিনি। আমাদেরকে বাঁধতে যাবেন কেন?

১ম ভৃত্য ঃ কেন বাঁধব- এবার মজা দেখাচ্ছি।

২য় ভৃত্য ঃ ডাকাত বেটারা- পালাচ্ছিলে। (মঘবা ও তার সঙ্গীদেরকে রাজ ভৃত্যরা বন্ধন করিল)

মঘবা ঃ মহাশয়গণ! আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। আর কোন চুরি ডাকাতি করিনি, বিনা অপরাধে কেন আমাদেরকে বাঁধিলেন।

১ম ভৃত্য ঃ কেন বেঁধেছি-তা-পরে টের পাবে।

২য় ভৃত্য ঃ তোমরা হলে নামজাদা ডাকাত বুঝতে- পেরেছিস্ এবার।

১ম ভৃত্য ঃ তোদের অত্যাচারে গ্রামে ঠিকতে পারছেনা। দিন দুপুরে ডাকাতি শুরু করেছিস।

২য় ভৃত্য ঃ এবার যখন ধরা পড়ে গেছ- আর রক্ষা নেই বাবা। এমন সাজা হবে একেবারে প্রাণটা নিয়ে টানাটানি হবে।

মঘবা ঃ আমরা গ্রামে রাস্তাঘাট তৈরি করে দিয়ে জনগণের যাতে মঙ্গল হয় তাই করতেছি। আমরা মানুষের সেবা করে আস্‌তেছি সম্পূর্ণ নির্দোষী হযে যদি রাজদণ্ড ভোগ করতে হয়- তাতে দুঃখ করবার কিছুই নেই। ভাইগণ তোমরা সকলে মৈত্রী ভাবনা কর।

(এখানে ধর্মানন্দের গীত)

১ম ভৃত্য ঃ অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

২য় ভৃত্য ঃ কত ভাল মানুষ? দেখাচ্ছ চল এবার (টানাটানি করিয়া) সকলে প্রস্থান)

(তৃতীয় অঙ্ক)
(দ্বিতীয় দৃশ্য)
স্থান = রাজ সভা
(রাজা ব্রহ্মদত্ত ও মন্ত্রী বলবাহন প্রবেশ)

ব্রহ্মদত্ত ঃ শুন মন্ত্রি বর! আমার রাজ্যে কি- আবার সত্যি সত্যিই চোর ডাকাতের উপদ্রব বেড়ে গেছে।

বলবাহন ঃ মহারাজ! রাজ্যে দুর্নীতি দমনের জন্য এত ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও রাজ্যে আবার চোর ডাকাতের উপদ্রব হবে-তা- আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে।

ব্রহ্মদত্ত ঃ স্বয়ং গ্রামের মাশুল এসে যখন অভিযোগ দিয়ে গেল। তা-তো দেখতে হবে ডাকাত্ ধরতে রাজভৃত্য পাঠিয়েছেন কী?

বলবাহন ঃ মহারাজা! ডাকাত ধরতে মচল গ্রামে রাজভৃত্য দিগকে পাঠিয়েছি।

(রাজভৃত্যের প্রবেশ)

রাজভৃত্য ঃ মহারাজ! মচল গ্রাম হতে ডাকাত দলকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।

ব্রহ্মদত্ত ঃ মন্ত্রি! ভৃত্যদেরকে আদেশ কর বন্দীদিগকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত করে প্রাণ দণ্ড দিতে।

বলবাহন ঃ মহারাজ! বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড দেওয়াটা -----।

ব্রহ্মদত্ত ঃ মন্ত্রি! আমার আদেশ পালন কর।

(গীত কণ্ঠে ধর্মানন্দ প্রবেশ)

এ সংসারে রাজধর্ম করা সুবিচার।
এমন দেশতো দেখিনি আর
বিচার নাই রাজার। ঐ
রাজধর্ম বিনিশ্চয়
বিচার করে দেখবে নিশ্চয়
দোষী কি-। নির্দোষী হয়।
দেখে শুনে হুকুম করে তার (ধর্মানন্দ প্রস্থান)

ব্রহ্মদত্ত ঃ মন্ত্রি! মুখে দুই কথা হতে পারে না। আমি যাই বলেছি তাহাই আদেশ।

বলবাহন ঃ মহারাজের আদেশ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। যাও- ভৃত্য রাজার আদেশ শিগগির পালন করগে।

রাজভৃত্য ঃ যথা আজ্ঞা। (রাজভৃত্য প্রস্থান)
(একজন রাজভৃত্য প্রবেশ রাজাকে প্রণাম করিল)

ব্রহ্মদত্ত ঃ বল কি সংবাদ-। আমার আদেশ মতে কার্যকরী করা হয়েছে কিনা?

রাজভৃত্য ঃ মহারাজ! বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। বন্দীদিগকে হস্তীর পদতলে দেবার জন্য যখন বধ্য ভূমিতে নিয়ে আসা হয় তখন মাহুত বড় দাঁতাল হাতিটাকে যখন নিয়ে আসছে। সেই দাঁতাল হাতিটা বন্দীদিগকে দেখার মাত্র বিকট শব্দ করে দ্রুত পালিয়ে যায়। মাহুত বার বার চেষ্টা করল- আর হাতিটাকে ফিরায়ে আনতে পারল না।

ব্রহ্মদত্ত ঃ বল- তারপর।

রাজভৃত্য ঃ মহারাজ! তারপর-পরপর চারটা বড় দাঁতাল হাতি আনা হল বটে বন্দীদিগকে দেখা মাত্র বিকট রব করে পালিয়ে যায়।

বলবাহন ঃ মহারাজ! আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে।

ব্রহ্মদত্ত ঃ বল মন্ত্রি! কিসের সন্দেহ?

বলবাহন ঃ মহারাজ! যেই হাতি সামান্য ইসারায়-অপরাধীকে নিমিষের মধ্যে পায়ের তলায় নিষ্পেষিত করে দিত, আর সেই হাতি পালিয়ে গেল বিকট শব্দ করিয়ে। হয়তো বন্দীদের এমন গুণ রয়েছে যার প্রভাবে হাতি পালিয়ে যায়।

ব্রহ্মদত্ত ঃ মন্ত্রি! বন্দীদের কাছে কোন কবচ কিংবা দৈ বৌষধী থাকতে পারে-যার গন্ধে হাতি পালিয়ে যায়।

বলবাহন ঃ মহারাজ! বন্দীদের কে বিচার করে দেখা উচিত মনে করি।

ব্রহ্মদত্ত ঃ যাও ভৃত্য! বন্দীদিগকে রাজ সভায় নিয়ে এসো।

রাজভৃত্য ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ। (ভৃত্য প্রস্থান)

ব্রহ্মদত্ত ঃ বল বন্দীগণ! তোমাদের নিকট কোন কবচ আছে কিনা। কিংবা কোন ঔষধ অথবা যাদুমন্ত্র জানা আছে কী?

মঘবা ঃ মহারাজ! আমাদের কাছে কোন কবচ কিংবা ঔষধ কিছুই নাই আর কোন যাদুমন্ত্র ও আমরা জানিনা। তবে আমাদের রক্ষা কবচ-আর যাদুমন্ত্র হলো- আমরা সকলে পঞ্চশীল পালন করি। সকলের প্রতি আমরা মৈত্রীভাব পোষণ করি। আর পথিকগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে- রাস্তা ঘাট তৈরি করি। বিশ্রামের জন্য পান্থশালা আর জলের তৃষ্ণা নিবারনের জন্য জলছত্র নির্মাণ করে দিয়ে থাকি। এই হল আমাদের যাদু মন্ত্র ও রক্ষা কবচ।

ব্রহ্মদত্ত ঃ ইহা কী সত্য?

মঘবা ঃ হাঁ- মহারাজ! সম্পূর্ণ সত্য। আমরা প্রাণী হত্যা করিনা, চুরি করিনা, মিথ্যা কথা বলিনা। পর দার লঙ্ঘন করি না, আর নেশা দ্রব্য সেবন করি না।

ব্রহ্মদত্ত ঃ হ্যাঁ- তবে গ্রামের মণ্ডল কেন তোমাদের বিরুদ্ধে ডাকাত বলে মিথ্যে অভিযোগ এনেছিল। আসলে দেখছি তোমরা ভাল মানুষ।

ভৃত্যগণ ঃ বন্দীদের বন্ধন খুলে দাও।

(রাজভৃত্যগণ বন্দীদের বন্ধন খুলিয়া দিল)

বলবাহন ঃ মহারাজ! এইসব মণ্ডলের মিথ্যে চক্রান্ত।

ব্রহ্মদত্ত ঃ যাও ভৃত্যগণ? মচল গ্রামের মণ্ডলকে শিগগির বন্দী করে নিয়ে এসো।

রাজভৃত্য ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ (ভৃত্য প্রস্থান)

ব্রহ্মদত্ত ঃ মন্ত্রি! দেখ এমন সাধু সজ্জনের বিরুদ্ধে কেন মিথ্যা অভিযোগ মণ্ডল নিয়ে এল- আমি তাই ভাবছি।

বলবাহন ঃ মহারাজ! আমি গুপ্তচরের মুখে জানতে পারলাম- পূর্বে গ্রামের লোকেরা মদ খেয়ে মারামারি কাটাকাটি করতো তখন মদের নেশায় তারা মণ্ডলের কাছে নালিশ করতো, তখন মণ্ডল সেই সুযোগে বাদী-বিবাদী উভয়ের কাছে মোটা অঙ্কের জরিমানা নিয়ে টাকা আদায় করতো। পরে এই মঘবা যখন গ্রামের লোককে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়ে সৎ পথে নিয়ে আসলো। তখন মদ খাওয়া আর মারামারি বন্ধ হলো। মণ্ডল আর তাদের কাছে টাকা না পেয়ে আয় কমে গেল। তাই এ চক্রান্ত।

ব্রহ্মদত্ত ঃ মন্ত্রিবর! সত্যই তা-হবে। মণ্ডল এহেন সাধু সৎ পুরুষের বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ নিয়ে এল- তার উপযুক্ত সাজা আমি দেব। চোর ডাকাতের নাম

যেমন শুনতে চাইনা, তেমন মিথ্যাবাদীর নাম আমি শুনতে চাইনা।

(মণ্ডলকে বন্দী করিয়া রাজ ভৃত্য প্রবেশ)

ব্রহ্মদত্ত ঃ মণ্ডল! এই নিরপরাধী সাধু সজ্জনের বিরুদ্ধে কেন মিথ্যা তুমি অভিযোগ এনে ছিলে-- বল?

মণ্ডল ঃ (কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ! মহারাজ!!

ব্রহ্মদত্ত ঃ বল! তোমার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা কি-না? মিথ্যাবাদীর কঠোর শাস্তি কি-জান! প্রাণ দত্ত!

মণ্ডল ঃ (কাঁপিতে) মহারাজ! আমি না বুঝে মিথ্যা নালিশ দিয়ে ছিলাম।

ব্রহ্মদত্ত ঃ ভৃত্যগণ! মণ্ডলকে নিয়ে যাও। হস্তীর পদ তলে নিষ্পেষিত কর। (ভৃত্যগণ মণ্ডলকে টানিতে লাগিল)

মঘবা ঃ (হাত জোর করিয়া) মহারাজ! উনি আমাদের গ্রামের মুরব্বি যদিও তিনি না বুঝে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ দিয়েছিল, এখন আমি মহারাজের নিকট সকাতরে তাহার প্রাণ ভিক্ষা চাই। মহারাজ! দয়া করে মণ্ডলের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

ব্রহ্মদত্ত ঃ মঘবা-! সত্যিই তুমি একজন মহাপুরুষ। মণ্ডল চেয়েছিল তোমাকে মারতে।আর তুমি চাও তাহার প্রাণ বাঁচাতে।

হ্যাঁ-তবে তোমার প্রার্থনা মতে আমি মণ্ডলকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমার আদেশ- মণ্ডল চির দিন তোমার পায়ের ভৃত্য হয়ে থাকতে হবে। আমার আদেশ যেন অন্যথা না হয়।

(গীত কণ্ঠে ধর্মানন্দ প্রবেশ)

ও-রে- এ সংসারে- মানুষ চিনা দায়।
বনের পশু চিনতে পারল
তোমরা চিনতে পারলে না হায়।
এ সংসারে মানুষ-যারা,
কুশল কর্মে সদা রত্ত তারা,
জ্ঞানের চক্ষে দেখবে যারা
মিলবে কয় জন এ ধরায় (ধর্মানন্দ প্রস্থান)

বলবাহন ঃ মহারাজ! পৃথিবীতে এখনও ধর্ম বিদ্যমান। মণ্ডল মঘবাকে চিনতে পারে নাই। কিন্তু হাতি পশু হলেও মহামানবকে চিনেছিল। বনের পশুরা পর্যন্ত মানুষকে চিনে, সে নরাধম মানুষ হয়ে চিনতে পারল না। মহাপুরুষকে উপযুক্ত সম্মান করা উচিত মনে করি।

ব্রহ্মদত্ত ঃ মন্ত্রিবর! এহেন শীলবান পরহিত ব্রতী ধার্মিক ব্যক্তি যে আমার রাজ্যে রয়েছেন- আমি আজ সত্যিই আনন্দিত। এখন চিন্তা করতেছি কি দিয়ে এই মহা পুরুষের সম্মান আমি করবো।

বলবাহন ঃ মহারাজ! এই মহাপুরুষকে যথোচিত পূজা ও সম্মান করুন।

ব্রহ্মদত্ত ঃ মঘবা! আজ হতে তুমি আমার বন্ধু! মিথ্যাবাদীর অভিযোগে আমি অনেক কষ্ট দিলাম। তাহা আমাকে ক্ষমা করে দাও। হাতি পশু হয়ে ও চিনতে পারল আর আমি মানুষ হয়ে চিনতে পারলাম না। আজ হতে আমি বিচার না করে কোন আদেশ করবো না।

মঘবা ঃ মহারাজ! আমরা সকলের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করি। কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ আমাদের নাই। সকলের প্রতি সদা সর্বদা ক্ষমা করি।

ব্রহ্মদত্ত ঃ বন্ধু মঘবা! আজ হতে আমার জ্ঞান চক্ষু ফিরে পেলাম। ঐ মচল গ্রামের জমিদারীসহ আর ধনরত্ন পরিপূর্ণ চারিখানি জমিদারী গ্রাম দান দিয়ে আপনাকে পূজা করলাম-আর বধ্যভূমিতে যেই চারিটা বড় দাঁতাল হাতি নেওয়া হয়েছিল সেই হাতিগুলাকে আমি আপনাকে দান করে দিলাম। আরও অনেক ধনরত্ন দান করতেছি এবার ইচ্ছামত দানাদি পূণ্যকর্ম করতে পারবেন আজ আমার হাতে রাজ আবরণ আমি পড়িয়ে দিচ্ছি।

(রাজা মঘবাকে নুতন রাজ আবরণ পড়িয়ে দিল)

ব্রহ্মদত্ত ঃ ভৃত্য! এখন মণ্ডলের বন্ধন খুলে তাকে ভৃত্যের পোষাক পাড়িয়ে দাও।

(ভৃত্য মণ্ডলের বন্ধন খুলে ভৃত্যের পোষাক পড়িয়ে দেওয়া হইল।)

ব্রহ্মদত্ত ঃ (মণ্ডলের প্রতি) শুন মণ্ডল! আজ হতে তুমি গ্রামের মণ্ডল নও। তোমার প্রাণ ভিক্ষাকারি এই মহা পুরুষ মঘবা হলো মচল গ্রামের জমিদার। তুমি সারা জীবন তার অনুগত ভৃত্য হয়ে থাকবে। অন্যথায় তোমার কঠোর শাস্তি।

মণ্ডল ঃ মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

মঘবা ঃ মহারাজ! আপনার মহৎ অন্ত করণের দান আমি সাদরে গ্রহণ করলাম। আজ হতে দশ রাজধর্ম নীতি পালন করে সুবিচার করিয়ে প্রজাগণকে পালন করুন। আর পঞ্চশীল পালন করে এই ক্ষণ ভাঙ্গুর মানব জীবনে দানাদি পূণ্য কর্ম সম্পাদন করে সুখে শান্তিতে রাজ্য সুশাসন করুন।

ব্রহ্মদত্ত ঃ বন্ধু মঘবা! যেই চারি মানি ধনরত্ন পূর্ণ গ্রাম দেওয়া হল নিষ্কর। এবার ইচ্ছামত পুণ্য কর্মসম্পাদন করে মানব জন্ম সার্থক করে তুলুন। পুণ্যবানের পূণ্য প্রভাবে আমার এই মগধ রাজ্য স্বর্গে পরিণত হউক। চল আজ।

(সকলে প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক
(তৃতীয় দৃশ্য)
স্থান = মচল গ্রাম

(রাজকীয় বেশ ভূষায় মঘবা, ভদ্রবেশে সুদাম, শীলানন্দ, সত্যানন্দ প্রবেশ)

মঘবা ঃ বন্ধুগণ! ধর্মের জয় চিরদিন ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম-চির উজ্জ্বল, চির দীপ্তিমান কোন দিন ম্লান হবে না।

আমরা যেই পঞ্চশীল পালন করি সেই শীলগুণ প্রভাবে আমরা মরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। সেই শীলের গুণ ও মৈত্রীগুণের প্রভাবে বনের পশু মদমত্ত হাতি পালিয়ে গেল। এবার আমরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে পুণ্য কর্মে মনযোগ দেব- এবার এক খানা বৃহৎ ধর্মশালা তৈরি করবো।

সুদাম ঃ অতি উত্তম প্রস্তাব।

শীলানন্দ ঃ তা-হলে একজন সুদক্ষ কারিগরে খোঁজ নিতে হবে।

সত্যানন্দ ঃ উত্তর পাড়ায় একজন খুব ভাল কারিগর আছে। তাকে নিয়ে আসলে অতিসুন্দর ধর্মশালা তৈরি করে দেবে।

মঘবা ঃ বন্ধুগণ! তোমাদের উৎসাহ দেখে আমি সত্যই আনন্দিত হলাম।

সুদাম ঃ উৎসাহ না থাকলে কোন কাজ হয়না। যেকোন কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ - উদ্যম ও প্রেরণা থাকতে হয়। তা-হলে প্রত্যেক কাজে বিপুল সাফল্য অর্জন করা যায়।

মঘবা ঃ সত্য বটে বন্ধুগণ! উৎসাহ উদ্যম হলো পুরুষের কর্ম শক্তি। এই কর্ম শক্তি নিয়ে আমরা স্বর্গের বিমানতুল্য-সুবৃহৎ ধর্মশালা নির্মাণ করে আমরা অক্ষয় পূণ্যভাগী হবো।

সুদাম ঃ ধর্মশালা তৈরি করতে- যত খরচ লাগে-সেই কারিগরের বেতন আমরা চাঁদা তুলে দেব।

মঘবা ঃ বন্ধুগণ! আমাদের পূণ্যের প্রভাব যদি থাকে- ধর্মশালা তৈরির খরচ কোন অভাব হবে না। রাজা আমাদেরকে অনেক সম্পত্তি ধনরত্ন দিয়েছেন। রাজপ্রদত্ত সমস্ত ধন রত্ন দিয়ে আমরা সারা জীবন পুণ্য কর্ম করে যাব। (সূত্রধর বাসি হাতে প্রবেশ)

সূত্রধর ঃ অনেক দিন পরে আপনাদেরকে আমি দেখতে এলাম।

সুদাম ঃ আমি একজন ভাল কারিগর তালাস্ করিতে ভেবেছিলাম।

সত্যানন্দ ঃ আমি এই কারিগরের কথা তো ভাগে- বলছিলাম।

মঘবা ঃ ভাই সূত্রধর! এ মেছ-খুব ভাল হয়েছে।

সূত্রধর ঃ আমাকে কোন প্রয়োজন হয়েছে নাকি?

শীলানন্দ ঃ প্রয়োজন না হলে কেহ কাহাকে স্মরণ করে নাকি?

সূত্রধর ঃ বলুন! আমার দ্বারা যদি আপনাদের কোন উপকার হয়ে থাকলে।

মঘবা ঃ ভাই সূত্রধর। নিশ্চয় উপকার হবে। আমাদের গ্রামের রাস্তার চৌ মাথায় একটা বৃহৎ ধর্মশালা নির্মাণ করতে আমরা স্থির করেছি।
তুমি যদি সেই কাজের ভারটা নিতে পারলে তা-হলে খুব ভাল হয়।

সুত্রধর ঃ ঘর বাড়ি তৈরি করা কিংবা ধর্মশালা নির্মাণ করা-তা-তো আমার পেশা। আমাকে যেমনি করতে বলেন- তেমনি সুন্দর করে তৈরি করে দেব।

সুদাম ঃ তা তো- আমাদের পছন্দ সই তৈরি করে দিতে হবে।

মঘবা ঃ ভাই সূত্রধর! যদি পার সেই ধর্মশালা নির্মাণ কাজের ভারটা লও। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে।

সূত্রধর ঃ যদি ধর্মশালা তৈরি কাজের ভারটা আমাকে দিতে চাহেন-তা-হলে আমি রাজী না হয়ে পারি কি? আপনারা শীঘ্রই প্রয়োজনীয় কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিন।

সুদাম ঃ তার জন্য কোন চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। আমরা সব যোগার করে দিচ্ছি।

শীলানন্দা ঃ আমাদের সুমহান সংকল্প এবার যদি পূর্ণ হয়ে থাকে।

সত্যানন্দ ঃ ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়।

মঘবা ঃ ধর্মশালা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে- অতিথিশালা, ভোজনশালা, পান্থশালা ও জলছত্র একই ঘরের ভিতরে থাকতে হবে।

সুত্রধর ঃ আপনাদের পরিকল্পনা মতে আমি সুন্দর করে তৈরি করে দেব। কাজের কোন ত্রুটি হবে না।

সুদাম ঃ এমন সুন্দর মজবুত চাই দেখলে চোখ যেন ঝলসে যায়।

সূত্রধর ঃ আগে আমি কাজটা করি তারপর দেখবেন কেমন হয়েছে।

শীলানন্দ ঃ আপনি যত সুন্দর করতে পারেন- ততই আপনার লাভ মজুরি তো পাবেনই আর পূণ্যও লাভ হবে।

মঘবা ঃ বন্ধুগণ! আমরা চিরদিন কেহ বেঁচে থাকবো না। আমাদের এই ধর্ম শালার পূণ্য স্মৃতিবহন করবে চির অমর হয়ে।

সুদাম ঃ ভাই কারিগর। কালবিলম্ব না করে আপনার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে হাতে দিন। শুভস্য শীঘ্রং অ শুভস্যং কাল হরণং।

সূত্রধর ঃ আমি দেরি করতে যাব কেন? কাজ না করলে ভাত খাব কোথায়?

শীলানন্দ ঃ আজকে যে দিনটা চলে যাচ্ছে কাল সে দিনটা ফিরে পাব না।

সত্যানন্দ ঃ শুধুদিন চলে যাচ্ছে নয়- সেই সঙ্গে হচ্ছে আমাদের আয়ু ক্ষয়।

(গীত কণ্ঠে ধর্মানন্দ প্রবেশ)

ও-রে কর্ম ছাড়া- নাই কিছু ভবে।
ধর্মশালা নির্মাণ করলে- পাছে কর্মের ফল পাবে।
কর্ম ছাড়া ধর্মরে ভাই হয় নারে ফলন।

বীজ ভিন্ন ক্ষেত্রে তরু হয় নারে যেমন।
কর্ম বৃক্ষ- করলে রোপন
পাছে কর্মের ফল পাবে। (ধর্মানন্দ প্রস্থান)

মঘবা ঃ বন্ধুগণ! আমরা কর্ম করে যাব। ফলের আশা পরে। ধর্মশালা নির্মাণের পূণ্যফল কখনো বৃথা যাবে না।
আমরা আজ মানবের সেবাধর্মে ব্রতী হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। রাস্তা ঘাট সবঠিক করা হয়েছে- পথিকগণ যাতায়াতের কত সুবিধা ভোগ করতেছে। এবার ধর্মশালার কাজ।

(গীত কণ্ঠে ধর্মানন্দ প্রবেশ)

এই অনিত্য সংসারের মাঝে
বল কিবা আছে আর।
আপন আপন বল শুধু। মিছে হাহাকার।
কর্ম যোনি কর্ম বন্ধু, কর্মই শরণ,
ইহ পরকালের সাথী হইবে আপন,
কুশল ও অকুশল যাহা কর সম্পাদন,
এ ভব সংসারে। ঐ
পূণ্য বিনে নাহি গতি,
কুশল কর্মেঃ রাখ মতি,
হবে তোদের স্বর্গে গতি।
যখন যাবে ভব পারে। ঐ। (ধর্মানন্দ প্রস্থান)

মঘবা ঃ বন্ধুগণ! এই অনিত্য সংসারে যার-কিছুই নাই। একমাত্র আমাদের কুশল কর্মই হবে যার। চল আজ। (ধীরে ধীরে সকলে প্রস্থান)

(চলমান)

অখেয়াল

-আমু রিটন

দিন দিন বরবাদ যাত
আমা জাত্‌ত-আ।
লেগা-পড়া ন পুরি,
বেয়ারন বানা ফাত্‌ত-আ।
মা-বাবে টেঞ্জা দেরণ,
সিটেঞ্জা লোই কনদে-
মদ খা, টাস খেলা খুনদি জেরং।
জিউন পান, সিউন খান,
স্কুল-কলেজত উলে ন যান।
খেবাক-বেবাক শেক অই টেঞ্জা,
মা বাবত্তুন ন পেলে-ওই উরন বেঞ্জা।
মদ হে, টাস খিলি দেগান মুরুঝিনি।
সি লগে বরবাদ জারণ,
স্কুল কলেজ পয়ানি।
কেনে উব আয়
কেনে উব উন্নত।
বাব-মা, দা-বে গন কণা
বেয়াক্কুন্ জুগরি উন্মুক্ত

ছাত্র, একাদশ, মানবিক বিভাগ
রাঙ্গুনিয়া কলেজ, চট্টগ্রাম।

ঝ-ড়ান্

-সংঘমিত্রা তন্‌চংগ্যা

টেবিলত্ বুসিলুং
খাতা-কলম ধুরিলুং
মনান চিত্ ন-বিযের
বারিত্তিন রিনি চালুং॥
চা-রঅ হায়ত্তিন দেখং-অর পাদাউন লুউত্তন
বুইয়া-রে সমারে পাইচ্ছুন উইত্তন।
মানুষসুন আইত্তন, তা-অল পুইল্যাং ধুরি-নে
গরুউন ধাহ্বা দিদন, নিউল উবা গুরিনে
চিউন গুরাউন দু-মাইত্তন,
মিসাইদ আ-বায়াদ-নপাইনে
ওঁয়াবা কানের, তারা রঅ-উন শুনিনে।
কি কি উড়ি যার, দেঘং-অর বুইয়ারে
আ-সের দেবাবা গুচুরি
ঝ-ড়ান্ লইনে॥

ছাত্রী, এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী
রাঙ্গামাটি সরকারি মহিলা কলেজ

গম পাং মুই তোয়ে

-মিতুন তঞ্চঙ্গ্যা

ম-মনান ভাবে ও ডুঙ বানা তয়ে....
হব ন পাং-ই মনান মুই, ও ডুঙ
গম পাইত না ন পাইত মোয়ে।
চিগুন চিগুন স্ববন দেগং, মুই তোয়ে লোই নাই....
মুই গেলে অ সুখ পে-এন ও তুঙ তয়ে গম পেনাই।
গমপানা হরক্কান জ্বালা তে-হবর পাই.....
যিবা তার মন মানুষ্যোরে বেগঅ তুন বেগ গম পাই....।
মুই হবঅ ন পাং গমপানা জ্বালা কিক্যা গয়ে....
এক্ক্যাগুই ক না ও ডুঙ গম পাং বানা তয়ে।
এদককি ছিক্ক্যা উলে, ভাবি ন পঅঙত মুই.....
তুই ন-নে কুয়ততে-মে
মে ছাড়া কাইরো নলুবে তুই।
একদিন কড়া কঅই ন পেলে দুগ লাগিল ত-তুন....
সেক্কে বুঝি পায়ং গে- ও ডুঙ
মে হরক্কান গম পেড়ে -ত মনত্তুন।
গিয়ত তোই মে-পেলে, চিরানগুইত তুই.....
ত ছি গমপানা লই বাচিতেইন মুই....।
ভাবি ন পঅঙত ছি গমপানান, কুরি আষি গিয়ে গই
ছি-ও পাগি গমন-প আই, মে পেলে গিয়ত তোই
জিরি তাইত গমে তেইত- ও ডুঙ....
মনে মনে বত মাঘি ঝং- ম- মনত্তুন....।
গম পিয়ং ও ডুঙ তোয়ে ম ই মনানত
কড়া ডিলুং ও ডুঙ তোয়ে ছাড়া কাই-অ....
গম ন পেইন ম-ই জীবনানত।

ছাত্র, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ১ম বর্ষ, ঢাকা কলেজ।

প্রত্যাশা

উত্তম তঞ্চঙ্গ্যা

আমি মুক্ত চিন্তার বিশালত্ব খুঁজছি,
তাই কালো মেঘের মতো ভয় হয়ে দাঁড়িওনা।
আমি দুর্গম পথের দুরন্ত পথিক হবো,
বালি বাঁধের মতো নিরাশার হাতছানি দিওনা।
মাটির পবিত্র গন্ধে বেড়ে উঠেছি আমি।
তাই কৃত্রিম পারফিউম দিয়ে আমার পবিত্র দেহকে নষ্ট করিও না।
আমি মানুষের হাতে সভ্যতার আলোর মশাল দেখেছি,
তাই হতাশার আবেগে সেই আলোর শিখা নিভিয়ো না।
আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছি,
আমার স্বাধীন চিন্তার দৃষ্টি টুকু কেড়ে নিওনা।
আমি পৃথিবীতে মানবতার জয়োধ্বনি দেখেছি,
আমার সেই পবিত্র স্বপ্নকে নষ্ট করো না,
আমি যুদ্ধের মাঝে মানবতার পরাজয়কে দেখেছি,
তাই মানবতাকে পুঁজি করে বিজয়ী হতে চাইনা।
আমি বাবা-মা'র স্নেহ, ভালোবাসাতে স্বর্গীয় উষ্ণতা পেয়েছি,
সেই স্বপ্নীল স্বর্গীয় জায়গাটি কেড়ে নিওনা।
আমি উন্নয়নের নামে দখলায়িত্ব চাইনা।
যে শাসক গোষ্ঠী আমার বসত ভিটাকে চাইবে।
আমি কষ্টের মাঝে সেই হাসি দেখতে চাই।
যে হাসি মানবতার জয়গানের পথ দেখাবে।

ছাত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা

বোধিপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাই,
স্বাধীনতা বলতে আমাদের কাছে কোন কিছুই নাই।
স্বাধীন দেশের নাগরিক আমরা, নামে মাত্র ভাই
পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে পারি নাই।
ধর্ষণ শব্দটি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত ভাই,
তুমাছিং-সুজাতার মত হাজারো মা-বোনের প্রাণ, কেড়ে নিয়েছিল তাই।
স্বাধীন দেশের নাগরিক বলতে লজ্জা লাগে ভাই,
তেরটি গণহত্যার বিচার আমরা, একটিরও পায় নাই।
যুগ যুগ ধরে সেনাশাসন চলে আসছে ভাই,
স্বাধীন দেশের অস্থিত্তের চিহ্ন, কোন কিছুই নাই।
কাপ্তাই বাঁধের কথা আমরা কখনো ভুলবো না ভাই,
এই বাঁধের কারণে লক্ষাধিক আদিবাসীকে, শরণার্থী হতে হয়েছে তাই।
জায়গা-জমি, বসত-ভিতা সবই হারাচ্ছি ভাই,
সরকারি সন্ত্রাসীদের কাছে আমরা বড় অসহায়।
ন্যায়-সুবিচারের জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে যায়,
প্রশাসন বলে তোমাদের জন্য কোন সুবিচার নাই।
সরকারের সাথে শান্তি চুক্তি হয়েছিল নামে মাত্র ভাই,
চুক্তির কথা বলে বলে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে যায়।
বাপ-দাদা তথা পূর্ব পুরুষদের জন্ম এই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাই
রক্ত দিয়ে হলেও আমাদের রক্ষা করতে হবে তাই।
আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাই,
স্বাধীনতা বলতে আমাদের কাছে কোন কিছুই নাই।

ছাত্র, কাঠমাণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়, নেপাল।

পাহাড়ি কান্না

-ধর্মরাজ তন্‌চংগ্যা

সবুজ পাহাড় ভাব করেছে,
মেঘের সাথে থেকে।
স্বর্গপুরী নাম দিয়েছে,
মানুষ সেটি দেখে।
ঝর্ণার পানি নেমেছে অবিরাম,
হাজারো ছন্দ তুলে।
নেমে পড়েছে স্নানের তাগিদে
দুঃখ সবই ভুলে।
লেকের পানি দেখে সকলে,
ভাবে, আহ এ যেন এক ভীনদেশ।
লক্ষ মানুষের বসত ছিল,
লেকের ঐ তলদেশ।
কাপ্তাই হাইড্রোলিকের থাবায়,
হারিয়েছি স্বর্বস্ব,
হয়েছি নিঃস্ব, হারিয়েছি মোরা শস্য।
রাজার ঘর আজ পানির তলে,
ইতিহাস সবই রসাতলে,
এখন সেখানে নৌকা চলে,
অবিরাম মাছের আশায়।
জুম ঘর দেখা যেত পাহাড়ের বুকে,
পাহাড়িরা সেখানে থাকতো সুখে।
এখন শুধু টিনের ঘরে,
সেটেলার হয়েছে পাহাড়ি।
বুক ফুলিয়ে তারা বলে বেড়ায়,
আমরা কি আর, তোদের ডরায়?
একপাশে মোর আছে মিলিটারি,
আছে মোর হিংস্র মন।

ভূমি দখল, ধর্ষণ-হত্যা,
করেছ তোমরা সৃষ্টি,
বাজে সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে,
ধ্বংস করেছো কৃষ্টি।
পাহাড় যে আজ কেঁদে চলেছে,
মোরা ঝর্ণা ভাবছি তাকে।
কোকিলের গান হারিয়ে গেছে,
গান করে এখন কাকে।
নিশ্চুপ মোরা, সর্বহারা,
তবুও বেচে থাকা।
স্বপ্ন দেখি, পাহাড় আমার
থাকবে হৃদয়ে আঁকা।

ছাত্র, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সবাই জানে অতঃপর

রবিচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

প্রথমঃ

আমি কখনও বলিনি কিন্তু সবাই জানে
কত নির্মম বেদনা বিধুর ও দুঃখ জনক অধ্যায়
বৎসর কে বৎসর কেটে যাচ্ছে সবাই দেখছে
কত শোচনীয়, কত বর্বরতা ও কত আগ্রাসন
যে না দেখে সে না জানে সে বলবে অবিশ্বাস্য অসম্ভব।
এ হতে পারে, তবে যা বলছি সবি সত্যি।
কিন্তু সে শোচনীয়, বর্বরতা আগ্রাসন না বললে নয়
তাই আজ বলতে ইচ্ছে করছে, কারণ,
যদি না বলি আমার প্রজন্ম আমাকে ধিক্কার দিবে।
চারদিক ঘন কুয়াশার মতো আগলে ধরেছে আমায়,
"আমার প্রিয় জুম্ম জাতি"
সুতরাং অসহায় হয়ে বলতে হচ্ছে-
ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে শাসন-শোষণ করে দুশো বছর অধিক
তাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল
পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের নিরীহ জনগণ।
তারপর শহস্র বিপ্লব অজস্র শহীদের প্রাণের ত্যাগে বিনিময়ে
১৯৪৭ সালে নেমে আসে ভারতীয়দের স্বাধীন হওয়া,
জন্ম নিল ভারত-পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় ঃ

অতঃপর জন্ম নিল আরেক অধ্যায়
পাকিস্তানের হিংসাত্মক থাবায় নির্যাতিত পুরো বাংলা
রাষ্ট্রের প্রতি সামরিক নিষ্পেষন, অর্থনৈতিক বৈষম্য,
শাসক বাহিনীর কবলে নিমর্জিত সোনার বাংলা।
১৯৪৭ পর আমার প্রিয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি
ঐ শাসক শ্রেণি বেড়াজালে আটকে গিয়ে,
এক মূহুর্তের জন্য স্বতন্ত্র অধিকার চেয়েছিল।
১৯৬২ সালে জুম্ম জাতির এক কালো ইতিহাস,

কাপ্তাই বাঁধ নামে জুম্মদের কাছে রাষ্ট্র উলঙ্গনীতি প্রয়োগ করে,
হাজার একর কৃষি জমি ডুবিয়ে দিল পানির নিচে।
বাস্তুহারা লক্ষ লক্ষ জুম্মো দৌড়াতে হলে পাহাড় পর্বতে
তারা হলো নিজদেশে পরবাসী।
অবশেষে বাংলার বুকে নেমে আসে আরেক সোনালি অধ্যায়
পাকিস্তানের নির্লজ্জ আগ্রাসন মেনে নিতে না পেরে,
বাংলার মানুষ স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে,
ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্ম-ত্যাগের মধ্যে দিয়ে,
১৯৭২ সালে পেলাম স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ।

তৃতীয়ঃ

আজ এ বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখছি
হাজার রঙ্গলীলা আবারও
দেখছি দুর্বলের উপর সবলের অন্যাচার,
আমাদের এই জুম্ম জাতির,
যেমনি করেছিল ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসক শ্রেণি
বর্তমানে শাসক শ্রেণির যে ভূমির আগ্রাসন,
লক্ষ লক্ষ সেটেলার বাঙ্গালি পূর্ণবাসন;
জুম্মজাতিরা আবার হারাতে বসলো
তাদের প্রিয় ভিটে মাটি, প্রিয় জন্ম ভূমি।
যন্ত্রনা কথা কে বুঝতে চাইবে (বুদ্ধিজীবি প্রতি),
তবুও লিখতে হয় ইতিহাসের পাতায়।
তাই এখন জুম্মদের বসে থাকার সময় নয়
এগোতে হবে দুর্বার সাহসে ও মনোবলে
প্রতিবাদের ঝড় তোলে অন্যায়কে পদদলিত করে,
আধিপত্য বাদীদের নীতি উপেক্ষা করে;
ছিনিয়ে আনতে হবে জুম্মোজাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রানাধিকার,
সত্যে ভবিষ্যত প্রজন্ম হবে পরাধীন
জাতি হবে কলঙ্কিত, অচল, স্তব্ধ ও দিশেহারা।

ছাত্র, প্রাচ্য ভাষা, ২য় বর্ষ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বলছি তোমায়

শান্তি চন্দ্র ত্রিপুরা

ভালবাসবো আমি-
যার হৃদয়ে কোন হিংসা নেই।
ভালবাসবো আমি -
যার হৃদয়ে কোন পার্থক্য নেই।
ভালবাসবো আমি-
অন্তরে দেমাগ নেই যার।
ভালবাসবো আমি-
যে সবার সাথে মিশতে পারে।
ভালবাসবো আমি -
যে দুঃখ - কষ্ট সইতে পারে।
ভালবাসবো আমি -
নিষ্পাপ মনে যে শ্রদ্ধা করে।
ভালবাসবো আমি-
নিষ্পাপ মনে প্রজারঞ্জন যে করে।
ভালবাসবো আমি -
ভেতরে যার গুণ আছে।
ভালবাসবো আমি -
ভেতরে যার শুভ্র মন আছে।
ভালবাসবো আমি -
স্বামীর দুঃখ বুঝে যে।
ভালবাসবো আমি -
স্বামীর শোকে কাঁদে যে।
ভালবাসবো আমি -
ঘনিষ্ঠকে যে অন্তরঙ্গতে রাখে।
ভালবাসবো আমি -
ঘনিষ্ঠকে যে লাঞ্ছনাতে না রাখে।
ভালবাসবো আমি -
মানুষ যেন তারে সুখ্যাতি করে।
ভালবাসবো আমি -
মানুষ যেন তার ব্যবহারে প্রসন্নতা করে।

গ্রাম ঃ কাপ্তাই হেডম্যান পাড়া
থানা ঃ রাজস্থলী, জেলা ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

মৃত্যু

কলম সৈনিক (সুজন)

মৃত্যু,
তুমি কি জানো? ....
মানুষ তোমার ভয়ে কতো দিশাহারা
হয়েছে!
হয়তো জানো না।
কিন্তু, তোমার জন্য ভয় নেই আমার
শুধু আমার নয়
আমার মতো অনেক সাহসীও আছেন
অতীতেও ছিলেন আর আগামীতেও
থাকবেন।
তবে, এ কথাও আমি জানি
তুমি শুধু আমার জীবনে নয়
সবার জীবনের কাছে
তোমার সময়ে তুমি আসবেই
সত্যি বলছি,
আমার কোনো ভয় নেই তোমার জন্য।
জানো,
আমার না দুঃখ শুধু একটাই
আমি আমার জাতির জন্য
কিছুই করতে না পারা।
তবে, করতে পারি ....
যদি তুমি আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত
আমাকে নিতে আসো।

ছাত্র, রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি।

গর্ব আমার

-সুস্মিতা তঞ্চঙ্গ্যা

কত বার কত ভাবে ভেবেছি
কত বার তোমার ভাষায় মুগ্ধ হয়েছি
কত বার তোমার প্রশংসা করেছি
কিন্তু কোন ভাষায় এত তৃপ্তি কি পেয়েছি?
তঞ্চঙ্গ্যা জাতিতে জন্মে আমি খুবই গর্বিত
অন্যের ভাষায় কথা বলে মাতৃভাষাকে ছোট করে
আমি করব না-কখনো জাতিকে অবহেলিত।
আমি নই কোন কবি
হয়ত দিতে পারব না জাতির স্তুতি
তবুও সর্বদা আমি তোমাকে নিয়ে গর্ব করি।
কেন জানি না মাতৃভাষা আমার অহংকার
আমার নেই কোন শব্দ-ভান্ডার
যার সাহায্যে পরাবো তোমার অলংকার
শুধু জানি আমি গর্বিত এক তঞ্চঙ্গ্যা জাতের সন্তান।

ছাত্রী, এস.এস.সি পরীক্ষার্থী
রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ভুলের মূল্য

-জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যা

কত রাত জেগেছি অভিমানী মনে
তোমার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি বলে।
আজ আর জাগিনা
আজ আর ভাবিনা
কেননা, আমি বুঝেছি হয়তো-
প্রতিশ্রুতি অন্য ছায়া ছিল ছলনা।
যেথা ছিল ভ্রান্তি কল্পনা
সেটাই আজ জীবনের বাস্তবতা!
যেথা ছিল ভূলের সম্ভার
সেথা আজ সত্য আর জ্ঞানের ভান্ডার
ভুলই ছিল জ্ঞান আর শিক্ষা
যেথা প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস।
কেননা, যেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব
যেখানে অসম্পূর্ণ সমস্ত জ্ঞানই।
ভুলের উপর চরণ ফেলে চলেছি অবিরত
যেটাই ছিল হয়তো নিয়তির বিধান
এ যেন আলো আঁধারে লুকোচুরি খেলা!
তবে সত্য জেনেছি এটাই
আত্মকৃত ভুলই ঘৃণা থেকে নিবৃত করে
এনে দেয় সত্যর সন্ধান।
চলতে চলতে হয়েছি কত পথহারা
হতবিহ্বল আর দিশাহারা
বেদনায় হয়েছি অশ্রুসিক্ত
কেননা, সুখকে নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করতে পেরেছি
লুকিয়ে রাখতে পারিনি দুঃখকে
ভেবেছি হয়তো দুঃখের মূল্য বড় বেশি।
তবে আজ আর ভাবিনা
কারণ-ভূল আছে বলেই
ধরণী ঐ সুন্দর এত প্রেমময়
ভুল আছে বলেই এত প্রচেষ্টা
অনুপ্রেরণা আর অগ্রযাত্রার চালিকা শক্তি
হয়তো এখানে ভুলের মূল্য!

ছাত্র, কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ।

জীবন

-মনজলিকা তঞ্চঙ্গ্যা

জীবন মানে, একটুখানী সুখ
আর কয়েক ফোঁটা চোখের জল
জীবন মানে, ক্ষণিকের সময়
আর কয়েকটি উপন্যাসের পাতা।
জীবন মানে চাওয়া আর পাওয়া
আনন্দে প্রফুল্লতা তার বেদনায় হতাশা
জীবন মানে, রাতের জোনাকি
অন্ধকারে ছুটে চলা।
জীবন মানে, স্বপ্নময়
আকাশ কুসুম পথে
মুসাফিরের মতো সন্ধানী।
জীবন মানে, প্রবাহীনির মাঝে
পাল তোলা তরী
পরম গতীতে ছুটে চলা।
জীবন মানে, দুর্ভেদ্য এক সীমানা
অসীম সাহস আর সিন্ধুর কিনারা।
জীবন তখনই বড় হয়
যখন নিজের দুঃটাকে লুকিয়ে
সুখটাকে বিলিয়ে দেওয়া যায়
সবার মাঝে।

ছাত্রী, রাজস্থলী কলেজ।

প্রতিজ্ঞা

স্বাধীন তঞ্চঙ্গ্যা

জীবন একটা ছোট গল্প
শুরুতে শেষ হয়ে যায়
স্বপ্ন যতো হোক অল্প
তবুও থাকি আশায়।
চাওয়া আর পাওয়া
যতো হোক দূরে
ছুটলো মশাল হাতে
দিগন্তের পানে ॥
সময় যদি হয় কঠিন
আছে যদি বাঁধা
করবো বরণ তা
আত্ম খুশিতে।
ব্যর্থতার গ্লানী
যদি হয় তানটে
ভেসে নিয়ে যাবো সব
খুশির জোয়ার তুলে।
আঁকবো রঙ্গিণ স্বপ্ন
হৃদয়ের তুলি দিয়ে
গড়বো এক নতুন সমাজ
সব বাঁধা পেরিয়ে ॥

ছাত্র,দশম শ্রেণি
বড়ইছড়ি কর্ণফুলি নূরুল হুদা কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয়

নব জোয়ার

-সুপন তঞ্চঙ্গ্যা (এসপি)

নব জোয়ারে ভাসছে দেশ,
চলছে সভ্যতা,
ঘুরছে পৃথিবী।
এই ধারাতে ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি
হচ্ছে বিলুপ্তি
দেখিনা আর কোথাও কোন
যুবকের পরিহীত দুতি আর গেঞ্জি,
তারই স্বরূপ পাঁচ পোষাকের পরিহীতা
তঞ্চঙ্গ্যা'র অপরূপ রমনী।
নতুনত্বের অভিমুখে
নিত্য নবীন দল,
ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি
হচ্ছে রদ-বদর (পাল্টা-পাল্টি)।
ওহে নবীন নতুনত্বের
এই কেমন-নব জোয়ার?
তাই বলে কী ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি
করবে হা হা কার?
আধুনিকতায় জোয়ারের সাথে
সবই যাচ্ছে ভেসে,
ওহে নবীন আগামীর জন্য
দিতে হবেই যে রেখে।:

ছাত্র, ছোট পাগলী পাড়া
কাউখালী, রাঙ্গামাটি।

আমাদের এই ক্লাস রুম

এক্র্যাচিং চাক

মনে পড়ে সেই দিনের কথা
রোজ সকাল ক্লাসে যেতাম,
মনে পরে সেই দিনের কথা
আমাদের এই ক্লাস রুম।
সেই চক, সেই লেক বোর্ড
সেই টিচার এর বক বক,
টিফিন পলায়ন ছাত্রী ছিলাম
ছিলাম দুষ্টমিটে ভরামন।
মনে পরে সেই দিনের কথা
এই আমাদের ক্লাস রুম,
বেঞ্চে লিখেছি বিদায় বিদায়
লিখেছি কত নাম,
মনে পরে সেই দিনের কথা
আমাদের এই ক্লাস রুম।

ছাত্রী, একাদশ, বিভাগ ঃ মানবিক
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ

বসন্ত ও নববর্ষ

নিরন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

বসন্তের বাতাসে ছুঁয়ে যায় মন
নববর্ষের হাওয়া বয়ে যায় সারাক্ষণ
কোকিলের গানে, বসন্তের হাওয়ায়
হে নববর্ষ তুমি আয় ফিরে আয়
বসন্তের বাতাসে কোকিল সুর তোলে
আনন্দের পরশে মানুষ দুঃখ ভুলে।
বসন্তের আলোড়নে কোকিলের গান শুনে
সুখের হাওয়া বয়ে যায় নিস্তব্ধ মনে
বসন্ত মানে “বৃক্ষভরা আমের মুকুল”
নববর্ষ আসবে সবাই আনন্দে আকুল
ফুলে ফুলে মৌমাছি, মুখে মুখে মধু
কখন ভরবে মৌচাক, তাদের এ কল্পনা শুধু
সুরে ভরা, কণ্ঠে ভরা কোকিলের গান
বসন্তই যেন নববর্ষের প্রাণ।

ছাত্র, এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী ২০১৬
বান্দরবান সরকারি কলেজ

অবিনশ্বর ভালোবাসা

-রুমি তনৃচংগ্যা

যদি হঠাৎ আমায় মনে পড়ে
দেখে নিও তোমার উঠোনের পুষ্প কানন,
অস্ত রবির মত একগুচ্ছ প্রস্ফুটিত ফুল
মৃদু মন্দ সৌরভে কাছে ডাকছে তোমায়।
ভেবে নিও আমি সেই ফুল।
যদি হঠাৎ আমায় মনে পড়ে
দেখে নিও বহুদূরে ঐ চির সবুজ পাহাড়,
অপূর্ব নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের লালিমা
ইশারায় সদা কাছে ডাকছে তোমায়।
ভেবে নিও আমি সেই প্রকৃতি
যদি হঠাৎ আমায় মনে পড়ে
দেখে নিও ঐ নীল আকাশ পানে,
উজ্জ্বল তারকাদের মাঝে একটি শুকতারা
শত হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকছে তোমায়।
ভেবে নিও আমি সেই শুকতারা।
শত হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকছে তোমায়।
ভেবে নিও আমি সেই শুকতারা।
যদি হঠাৎ আমায় মনে পড়ে
দেখে নিও এমন একটি কবিতা।
পরিপূর্ণ কাহিনীতে ভরা প্রতিটি শব্দ
বারবার কাছে ডাকছে তোমায
ভেবে নিও আমি সেই কবিতা।

ছাত্রী, দ্বাদশ শ্রেণি, মানবিক বিভাগ
কর্ণফুলী কলেজ।

স্বপ্ন

-পার্বতী তঞ্চঙ্গ্যা

স্বপ্ন আমার অনেক গুলি;
কোনটা ফেলে কোনটা বলি!
কিন্তু স্বপ্ন পূরণের নেই কোন প্রচেষ্টা
মাঝে মাঝে আনমনে ভাবি
কেন আমি এমনটা?
সবাই স্বপ্ন পূরণে যাচ্ছে এগিয়ে
আর আমি এখনো বিছানায় ঘুমিয়ে।
মা যখন বলে "পড়ছ নাকি"? কই?
তখন আমি হাতে নিই উপন্যাসের বই।
স্যার যখন বলে "জীবনে অনেক বড় হতে হবে"
মনে মনে আমি বলি
"আজি" দেবদাস" উপন্যাসটা শেষ করতে হবে"
এভাবে চলতে থাকলে
হবে কী আমার স্বপ্ন পূরণ!
ভয় লাগে হয়ত একদিন
হবে আমার অস্তিত্বের মরণ।
অলসতা পরিহার করে
এগিয়ে যেতে চাই সামনে
অনন্য ভূমিকা রাখতে চাই
সুন্দর উন্নত জাতি গঠনে।

ছাত্রী, একাদশ, মানবিক
বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ।

স্পর্শ

-সুচরিতা তন্চংগ্যা

তোমার আর আমার মাঝে নেই সম্পর্ক
নেই ভালোবাসা-প্রেম-মায়া-মমতা
তবে,
আমিতো ভালোবাসতে চেয়েছিলাম
চেয়েছিলাম তোমার হৃদয়ে গভীরের স্পর্শ নিতে
চেয়েছিলাম তোমার জীবনের প্রকৃত বন্ধু হতে।
প্রকৃত বন্ধু হয়ে, জানাতে চেয়েছিলাম
সত্য, যুক্তি, বিজ্ঞান, প্রগতিকে।
জানাতে চেয়েছিলাম
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকে,
জানাতে চেয়েছিলাম
রাজনীতি-অর্থনীতির আধিপত্যের সংঘর্ষকে,
জানাতে চেয়েছিলাম
বিজ্ঞানের অপব্যবহারকে,
বোঝাতে চেয়েছিলাম
সুদূর ভবিষ্যতকে।
দেখাতে চেয়েছিলাম
চারদিক পরিবর্তনের হাওয়াকে,
শেখাতে চেয়েছিলাম
নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে,
বোঝাতে চেয়েছিলাম
প্রকৃতির প্রতিশোধ পরায়ণকে।
কিন্তু তুমি,
আমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে ছিলে
দেখেও না দেখার ভান করেছিলে - তুমি ॥
যাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ছিলে তুমি
তারা আসলে তোমার কেউ প্রকৃত
বন্ধু ছিল না ॥
আমি জানি,
তুমি এখন নেশাগ্রস্ত, হতাশা, দুর্বল, আতঙ্ক
চেতনাহীন, বুদ্ধিহীন, ধৈর্য্যহীন
তুমি এখন বিপদ মুখী,
কারণ,
তুমি নিজেকে নিজে জানার চেনার বোঝানার
চেষ্টা করো নি ॥
আজ তাই তোমার এমন অবস্থা ॥

ছাত্রী, এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী
বান্দরবান সরকারি কলেজ।

তন্‌চংগ্যা গান

-ঋত্বিক তন্‌চংগ্যা

দূর আদামর টান্যাবি
কুদি গি অয়ত্ তুই ...?
মনে মনে তয়াং তরে
কুদি আহ্‌ত তুই ..... ! !
যক্কে তরে দিগকেয়ং মুই
ওয়াপ্পা পথতানত
ছক্কে মুই থুইয়ং তরে ম মনা নত... ! !
গম পাই য়ং যক্কে মুই তরে ... ! !
ছক্কে লাক্ষি থুয়ং তরে ম-ন ভিদিরে .... (ঐ)
আগে কাইল্যা পরাইন্যা টান্যাবি কদা
মনত্ উদিলে থাই ন পারং তরে ছাড়া ... !!
ও মনবি ....ও..... টান্যাবি ...... ! !
তরে ছাড়া থাই ন পারে ম-মনানি..... (ঐ)
ছড়া-ছড়ি, মুড়া-মুড়ি তয়াই চালং মুই
ত দক্কেয়া গাবুরি ন পালং মুই ....! !
ও মনবি ....ও গাবুরি..... ! !
কুদি গেলে পাইন তরে কই যাবে নি....???

ছাত্র, কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ।

তঞ্চঙ্গ্যা গান

-অতশী তন্‌চংগ্যা

দেবা ঝিমিলার ঝিমিত ঝিমিত
বুয়াবান বা-র বানা
হাক্কন পয়ে ঝড় দিব
কুদি আহইত হনা .... (২)
ও পরান দা ..... (২)
তরে মনত উদের বানা (২)
মিইলা দেবাবাত বাইচ্ছুন যাইদন-উড়ি
কাম-অ-মানুচ্ছুন-যাইদন (২)
বাক্কুন-ঘরত-ফিরি!
ও পরান দা .... (২)
তরে মনত উদের বানা (২)
মনান নথার মনত তরে চিত পুরের
কুদি আহইত কেনেক্যা আহইত
তুই কুবেনি মরে (২)
ও পরান দা ..... (২)
তরে মনত উদের বানা (২)

ছাত্রী, ইডেন কলেজ, ঢাকা।

তঞ্চঙ্গ্যা বানা ধয়ানা (ধাঁ-ধাঁ)

১. চাল-অ উবে ব-অ মুগ,
যে ভাঙে নফে তে বু-আ শুগ।
উত্তর ঃ লোগুলা (লাউ)

২. চিগুন-অ লক্কে কা-রা,
দাঙ্‌ উলে পা-রা।
উত্তর ঃ শন (খড়)

৩. সাত গাঙ সাছুইনায়,
বাক্কা-আ আস্যেত গুদিইনায়
উত্তর ঃ বুট (বোট)

৪. ঘ-অ জগা কুআ ঘু পুশা
উত্তর ঃ বর-অ বান (বেতের ঘিরা)

৫. খাইরে গুলা বু-ড়ু নাই
উত্তর ঃ ব-রা (ডিম)

৬. চিগুন-অ লক্কে পিনুইন পিন-নিয়া,
দাঙ্‌ উলে লাঙদা - বান্দা
উত্তর ঃ বাঁশুই (বাঁশ কোরল)

৭. লুরি টালিলে মোইন দুলে
উত্তর ঃ দোলাইন (দোলনা)

৮. চিগুন পোয়ায় গাই-ছত উড়ন।
উত্তর ঃ পি-ইবা (পিঁপড়া)

৯. লুরি টানিলে মোইন ঘুচে।
উত্তর ঃ খেংখরং (বাদ্যযন্ত্র)

১০. কালা বন-ত মানুইত বেয়ান।
উত্তর ঃ উগুইন (উকুন)

১১. বিল শুগেলে বগা ময়ে
উত্তর ঃ চেয়াগ (কুকি)

১২. কালা কু-আ পুন্ধি মগ।
উত্তর ঃ জেরেনা (জুমের আখ)

জ্যোৎস্না তঞ্চঙ্গ্যা ও মিতালী তঞ্চঙ্গ্যা
রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

১. চার অক্ষরের নাম যার ছোটরা খেলে
সামনে দুই অক্ষর বাদ দিলে
আকাশেতে উড়ে। পিঁছনে দুই অক্ষর
বাদ দিলে কিছু না দেখে।
উত্তর ঃ কানামাছি

২. এক অংশ দুই পিঠ সকল জনে খায়।
মৃত্যু হলে দুই অংশ পৃথক হয়ে যায়।
উত্তর ঃ ঝিনুক

৩. ছোট বেলায় দুলেছি বড় হয়ে পেঁকেছি
বুড়া হয়ে ল্যাংটা হয়ে বাজারে গিয়েছি।
উত্তর ঃ ধান, চাউল

৪. চার অক্ষরে নাম যার ইতিহাসে পাওয়া
যায় সামনে অক্ষর বাদ দিলে
মুসলমানদের পাওয়া যায়।
উত্তর ঃ আকবর, কবর।

৫. চার দিকে পানি মধ্যখানে বসে আছে
বুড়ো রাজার রানি।
উত্তর ঃ শাপলা ফুল।

৬. লাল গরু বন খায় পানি পেলে মরে
যায়।
উত্তর ঃ আগুন।

৭. চলতে চলতে মরে যায় মাথা কাটলে
বেঁচে যায়।
উত্তর ঃ পেন্সিল।

৮. সাগরেতে জন্ম নগরেতে বাস, জলে
পড়লে সর্বনাশ।
উত্তর ঃ লবণ।

লিপাপুরী তঞ্চঙ্গ্যা ও পাবর্তী তঞ্চঙ্গ্যা
বারন্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ

শ্লোক

১। আদিদে-আদিদে নলা-গাইদে-গাইদে-গলা
২। আত-পুত্যে-কুচু-পাধা-ধরানা
৩। খাবার - ওইট-গুল্যে নিজে-যোক
৪। অবিল - গাছগ-মালি-ফুল
৫। এরা- পুত্যে-চিক-গাদি-পুড়ে
৬। কানেদে-পআ-দুধ-খাই-পাই-না
ন-কানেধে-পআ-দুধ-খাই-পাই-দে
৭। যুব-বুধুরে-পরোল্ল আ
৮। আদে-গড়েদে-না-বেলে-গরে-দে
৯। আওলো-খিল-গাওয়া-খিল যা-কবালট জি-মিলিল
১০। কুলে-কয়-নকুলে-রয়
১১। চুঅ-পানি-শন-শনার
১২। চেমেলে-এব্বাগ-দেচ্ছাইদ-এব্বাগ
১৩। জিদি-রাইদ-ছিদি-খাইদ
১৪। জি-বায়রে-ধরাই-সি-বায়রে-লাপ্পাই
১৫। এয়াল্যা-চাইট-নগুল্যে-ভাল-মন্দ-নবুছে
১৬। এক্কয়া-শিলট-এক্কয়া-কাঁআড়া
১৭। এল্লেচা-ঝড়ে-বাইটা-ন-জাই
১৮। কুউরে-নছারে-ছাই-মাইন-দে-নছারে-ভাই
১৯। অদট-নথালে-পদথ-কুদি-পাবার
২০। আলু-য়ে-কুক্কুদায়-নে-কুচুরে কুক্কুদাই-দে
২১। এক-খিলি-পান-আজার-ত্তঁয়া-মান
২২। চেব ভরে - ন-নডুবে,- দুগ-গিল্যে, পানিত্তেক-নমরে
২৩। গয়াইন-মাদা-গুচি-খাবালেয়-ন-উব
২৪। ছাঅল-মুদিদে-ধরা-পড়ে
২৫। গাঁয়ে-নালে-পং-গরেয়া-
২৬। কলা-কুশ্যাল-কি-মিদা-সিত্তুন-বেইট-থে-মিদা
২৭। ঝুড়-পানি-মাইদ-নে-গরম-পানি-মাইদ
২৮। কোই-পোই-ন-পিদা-খাইয়ট
২৯। যা-বাবরে-কুমিরে-খাই-ঢেউ-দিহিলে থে-ধরাই
৩০। চামুয়-লেশঅট-শামুচে-বাড়ি দেনা
৩১। আচ্য়া-কত্তে-এরেত্তই-গা

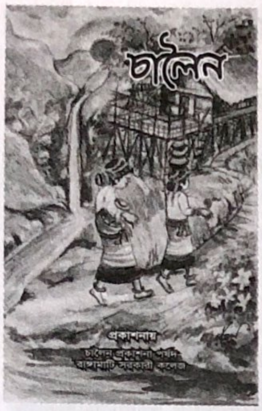
পরিচিতি ঃ সুবাস তঞ্চঙ্গ্যা, বারঘোনিয়া, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।

শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি

চাৌলন

(তনৃচংগ্যা শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক বিষু প্রকাশনা)

বিষু/২০১৬ খ্রিঃ উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন



প্রথম সংখ্যা



দ্বিতীয় সংখ্যা



তৃতীয় সংখ্যা



চতুর্থ সংখ্যা

"তিন বছর পেরিয়ে চার বছরে পদার্পন"

চাৌলন শুধু তনৃচংগ্যা সাহিত্য প্রকাশনা নয়, অনলাইন ভিত্তিক প্রকাশনাও। যেখানে আদিবাসীর বিভিন্ন অধিকার বিষয়ে লেখালেখি হয়।

চাৌলন প্রকাশনা পর্ষদ,
রাঙামাটি সরকারি কলেজ।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
হিরো তঞ্চঙ্গ্যা, সম্পাদক, চাৌলন প্রকাশনা পর্ষদ, রাঙামাটি সরকারি কলেজ।
মোবাঃ ০১৮২০৩৬৪৭৬৪, ০১৫৫৭০৮৯৯৫৩।

চাৌলন কপি প্রাপ্তি স্থান ঃ
রিপন টেলিকম এন্ড কম্পিউটার
রাঙ্গামাটি বেসিকের বিপরীত পার্শ্বে, (স্টেডিয়াম মার্কেট), রাঙ্গামাটি।
ফোন ঃ ০১৬১২৬৪৪৪০০/০১৯১৪৫৯২০৭৩
Email: ripantong@gmail.com